

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

সুরাইয়া বেগম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ



খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

সুরাইয়া বেগম

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

Food Security & Food Sovereignty

সুরাইয়া বেগম

Suraiya Begum

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৯

Published in: December, 2019

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 07 (Kajoli), Road 17, Block C,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de/en/

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de/en/

মুদ্রণে:
ফেমাস প্রিন্টিং
খ-১১৫/৬, জামতলা, নিকুঞ্জ-২
রোড-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

Printed by:
Famous Printing
Kha-115/6, Jamatala, Nikunja-2
Road-1, Khlkhet, Dhaka-1229

ছবি : প্রচ্ছদ
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কৃষক
ইউসুফ মোল্লার আতিথেয়তা

Picture cover
Hospitality of the gold medal winner
farmer Yusuf Mollah at his house

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ এবং গণগবেষণা" প্রকল্পে। যার বিষয়বস্তু কৃষি, কৃষি-প্রতিবেশ, কৃষক সমাজ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব, নিরাপদ খাদ্য প্রভৃতি। প্রকল্পের কাজের উদ্দেশ্য এ-সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে এর চর্চা করা। রিইব মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে একশন রিসার্চের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। সেই সাথে প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করাও রিইব এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির যে স্তরে রয়েছে তাতে জ্ঞান সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ। রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌছে দেবার লক্ষ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলায় প্রকাশ করছে এবং সেসব প্রকাশনা গণগবেষণা দলে এবং লোকাল স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, এর মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করছে।

'কৃষি প্রতিবেশ' বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই এর শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এসব বই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

রিইব আরও মনে করে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন সেক্টরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে। রিইব তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এই সম্মিলিত প্রয়াস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি জনগণের কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌছে দেবার চেষ্টায় জ্ঞান উৎপাদন করবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে এই ধরিত্রীর প্রতিবেশ সুস্থ্য থাকে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে রিইব এর ক্ষুদ্র প্রয়াস এইসব প্রকাশনা।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ---------- ৫

খাদ্য নিরাপত্তা ---------- ৭

নিরাপদ খাদ্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ---------- ১৭

খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক খাদ্য রাজনীতি ---------- ২২

বিকল্প প্রেক্ষিত খাদ্য সার্বভৌমত্ব ---------- ২৮

খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় জীববৈচিত্রনির্ভর কৃষি ---------- ৩২

উপসংহার ---------- ৩৭

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্বীকার করা হয় যে, সকলের অধিকার আছে মানসম্মত জীবন যাপনের, তার নিজের ও পরিবারের স্বচ্ছলতা এবং পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তির। অর্থাৎ খাদ্য হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, এটি আমাদের সংবিধানেও স্বীকৃত। এই অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইতিমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এই অধিকার অর্জন কিংবা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিষয়টি। যার সঙ্গে রয়েছে দেশজ ও আন্তর্জাতিকতায় খাদ্য নিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির বিরাজমান ধারা। অন্যদিকে খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু, কেননা তা মনুষ্য প্রজাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি খাদ্য নিরাপদ না হয়, তাহলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার খাদ্যে যদি সকলের অভিগম্যতার সুযোগ না থাকে তাহলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং দূর্ভিক্ষের মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে। আবার যদি নিজের সংস্কৃতির ভিত্তিতে, নিজের পছন্দ মত, পরিবেশ উপযোগী খাদ্য খাবার সুযোগ না থাকে তাহলে ব্যক্তির নিজস্বতা, সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। দেশজ ও আন্তর্জাতিকতায় বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিজ অবস্থানকে বোঝা এবং সেইমত কাজ করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বিশেষ করে যারা খাদ্যের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ সহ সবকিছুর সাথে জড়িত, সেইসব চাষী বোন ও ভাইদের এসম্পর্কে জানাবোঝাটা জরুরী। বইটি তাঁদের কাজে লাগলে সেটা হবে বড় প্রাপ্তি।

জার্মানির রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর প্রতি আমাদের ঋণ, জীবন ঘনিষ্ঠ এসব বই লিখতে সহায়তা করার জন্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দিল্লী অফিসের সকল সহকর্মীসহ প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কষ্টি-র প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে অন্তহীন উৎসাহ ও সহযোগিতা দেবার জন্য। Agro-ecology from Below: Pedagogy and Participatory Action (2019) প্রকল্পের সকল সহকর্মী এবং কৃষক ভাই-বোনদেরকে ধন্যবাদ সবরকম সহযোগিতার জন্য।

সুরাইয়া বেগম
প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব



খাদ্য নিরাপত্তা

১. ভূমিকা

খাদ্যের সাথে মানবসমাজসহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের একটা অনিবার্যতাও আছে। খাদ্যের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এর উৎপাদকদের সাথে। খাদ্যের সাথে মানব দেহের সুস্থ্যতার সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনাচরণ। খাদ্যের সাথে জড়িত রাজনীতি - দেশজ এবং আন্তর্জাতিক। খাদ্য তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক একটি বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। খাদ্যকে ঘিরে তাই বিভিন্ন কনসেপ্ট সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি কনসেপ্ট বা প্রত্যয় বর্তমান বিশ্বের দেশজ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোচিত - ১. খাদ্য নিরাপত্তা, ২. নিরাপদ খাদ্য ৩. খাদ্য সার্বভৌমত্ব। এই বইটি আবর্তিত হয়েছে এই তিনটি প্রত্যয় নিয়ে এবং চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা জানাবোঝার প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়, ধারণা তৈরী হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি প্রত্যয়কে খুব আলাদা করে পৃথকীকরণ করা যায় না কেননা এগুলো পরস্পর অনেক বেশি জড়াজড়ি করে আছে। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সুক্ষ্ম বিভাজন কাজ করে। সে কারণেই এই তিনটি কনসেপ্ট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। যাতে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিমানের উন্নয়ন সাধন ঘটে।[১]

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (১৯৯৬) মতে খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে সব মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পছন্দমত পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির জন্য বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকা। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি মূল দিক ঃ ১. খাদ্যের সহজ প্রাপ্যতা অর্থাৎ খাদ্য যাতে সহজে পাওয়া যায় তার জন্যে বাজারে যথেষ্ট যোগান থাকা; ২. খাদ্যের লভ্যতা অর্থাৎ বাজারে বিদ্যমান পর্যাপ্ত খাবার থাকতে হবে এবং সেই খাবার কেনার জন্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতা থাকতে হবে। ৩. স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য অর্থাৎ যে খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে শরীর সুস্থ্য ও কর্মক্ষম থাকে। যার সংক্ষেপ করলে এটা দাঁড়ায় যে, জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকবে। সকল সময়ের জন্য, সকল এলাকায় খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল থাকবে। সবাই যে কোন সময়ে, তার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য ক্রয় বা সংগ্রহ করতে পারবে। যে খাদ্য সংগ্রহ বা ক্রয় করা হবে তা হবে স্বাস্থ্যের জন্যে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর।

মধ্য সত্তর দশকে 'খাদ্য নিরাপত্তা' ধারণাটির উৎপত্তি হয়, যখন কিনা বিশ্বে খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। এসময় দূর্ভিক্ষ, ক্ষুধা এবং খাদ্য সংকট বিশ্বে ছিল চরমে। ১৯৭৪ সালে 'ওয়ার্ল্ড ফুট সামিট' এ খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞায়ন করা হয় এভাবে বিশ্ব খাদ্যের যোগান অর্থাৎ মৌলিক খাদ্য দ্রব্যের যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ থাকতে হবে এবং তাতে বাজারে সহজেই প্রাপ্য হতে হবে। ১৯৮৩ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর সঙ্গে ভালনারেবল (Vulnerable) জনগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করে। এখানে বলা হয় সকল জনগণের, তাদের মৌলিক খাদ্য চাহিদার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকার থাকবে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার[২] (Food and Agriculture Organization, FAO) সংজ্ঞানুসারে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এক. প্রতিটি পরিবার ও সমগ্র জাতির জন্য প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা। দুই. স্থান ও সময় ভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব। তিন. নিরাপদ ও মানসম্মত পরিমাণ খাদ্যের প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা।

জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সারাদেশের জনগণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে, প্রয়োজনীয় অবাধ ও মানসম্মত খাদ্য সংগ্রহণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ, খাদ্য আমদানী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় জড়িত। আবার মানুষের তৈরি পরিস্থিতিও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫৪-৫৬ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের দূর্ভিক্ষগুলি ছিল মনুষ্য সৃষ্ট।

খাদ্য নিরাপত্তা দুই ধরনের। এক. পরিবারের বা গৃহের খাদ্য নিরাপত্তা এবং দুই. জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিটি পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। যে সক্ষমতায় পরিবারের প্রতিটি লোক সবসময় সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারে। একইভাবে

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা দেশের সকল জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করার সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। খাদ্য নিরাপত্তা শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মঙ্গা, দূর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনটন ইত্যাদি শব্দগুলো। যেগুলো সব একেকটা প্রেক্ষিতকে সামনে তুলে ধরে।

দারিদ্র্যকে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় । পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনে ব্যর্থতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ক্রয়ক্ষমতার দৈন্য ও নানা প্রতিকূল কারণে সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তার অভাব দেখা দিতে পারে। কেননা পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নানা আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেমন পারিবারিক আয়, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ, শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা মৌসুমের কারণেও প্রভাবিত হয়। একসময় মঙ্গা ছিল মৌসুম ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। আমাদের দেশে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। তার মধ্যে রয়েছে ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন কৃষক, দুঃস্থ নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগণ। অন্যদিকে দেখা যায় যে, দানাশস্য জাতীয় খাদ্যের হয়ত অভাব নেই কিন্তু মানবশরীর গঠনে যে পুষ্টির প্রয়োজন তার প্রচুর অভাব আছে আমাদের দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের । পুষ্টিহীনতাও এক অর্থে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। যদি দেশে অপুষ্টির সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে সমাজবিজ্ঞানীরা একে প্রচ্ছন্ন দূর্ভিক্ষ বলে থাকে। সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তার সাথে এতসব অনুষঙ্গ জড়িত।

বর্তমানে আমরা বিশ্বায়নের যুগে বসবাস করছি এবং দেখছি যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তার জন্যে একটি বড় হুমকি। কেননা জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে জনসংখ্যা হবে ৯ বিলিয়ন। বর্তমান বিশ্বে এখনও ১ বিলিয়ন মানুষ দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে দেশেও খাদ্য চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে উত্তরণে প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষম বন্টন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এতসব উন্নয়নের পরও তিন চতুর্থাংশ দরিদ্র এবং ক্ষুধার্ত মানুষ গ্রামে বাস করে।[৩] কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে ঠিকই, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে তারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। কৃষকদের প্রয়োজন হলো স্থিতিশীল উৎপাদিকা শক্তি এবং আয় বৃদ্ধির নিশ্চিত ধারা। কিন্তু অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাবের কারণে কৃষকের পক্ষে এই অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[৪]

৩. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা

সত্তর দশকের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি প্রায় পুরোপুরিই প্রাকৃতিক কৃষি ছিল। কেমন ছিল বাংলার কৃষির উপকরণ এবং কৃষি-প্রতিবেশ তার বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষকের লেখনীতে এবং গবেষণা গ্রন্থে।[৫] যেখানে বাংলাদেশের অন্যতম ফসল ধান-এর চাষ, এর ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য, সার, সেচ এবং ফলন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। শত শত বছর যাবৎ বাংলাদেশের মানুষ প্রায় ৮৫ ধরনের কাজে ১,৩৬৪ প্রজাতির দেশি-বিদেশি উদ্ভিদ চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে আসছে। এদেশে প্রায় ১৭৫ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ জন্মাতো। প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা বিভিন্ন শস্য এবং উদ্ভিদ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করত। ধানের জীববৈচিত্র্য ছিল উল্লেখ্য, এদেশে ধানের প্রায় ১০ হাজার প্রকারভেদ ছিল।

কৃষিতে পরিবর্তনের স্বরূপ

১৯৪০ এর দশক থেকে, পশ্চিমা দেশগুলো (আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ) এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে 'অনুন্নত' আখ্যা দিয়ে তাদের' উন্নয়নের' দায়িত্ব নেয়। এজন্য স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বব্যাপী একই রকম একরৈখিক 'উন্নয়ন' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এই উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়, ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান বৃদ্ধি শুরু করে এবং কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে 'উচ্চ ফলনশীল' (উফসি) জাতের বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে উত্তরের দেশগুলো থেকে পুঁজি, দক্ষতা ও প্রযুক্তি দক্ষিণের দেশগুলোতে আসা শুরু হয় এবং বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে। এভাবে আমেরিকা বা ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক ও ভোক্তারা যুক্ত হয়ে যায়। পরবর্তিতে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'-র মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়।

সবুজ বিপ্লব

এসময় রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি- IRRI) ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) প্রতিষ্ঠা করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উইলিয়াম গড সবুজ বিপ্লব কথাটি চালু করেন এবং ১৯৬৯ সালে আমেরিকান সরকার 'সবুজ বিপ্লবকে' বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়াতে সবুজ বিপ্লবের আওতায় ফিলিপাইন ও মেক্সিকো থেকে ধান ও ভূট্টার উফসি বীজ আমদানী করা হয়, যেগুলো চাষ করতে প্রয়োজন সেচযন্ত্র, ডিজেল, সার ও বালাইনাশক। "সবুজ বিপ্লব" এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। তাই এর চাষযোগ্য শস্য হচ্ছে একক দানাশস্য ফসল যেমন গম, ধান। প্রথম দিককার উৎপাদনের পরিমাণ দেখে কৃষকরা ক্রমশ: এই একক দানাশস্য চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন খাদ্যাভাস ও ফসল বৈচিত্র্য ছিল সেসব ক্রমশ: হারিয়ে যেতে থাকে। পাশ্চাত্য কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে কৃষক খাদ্য চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

খাদ্য নিরাপত্তার জন্যে যেহেতু উৎপাদনকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বর্তমান বাজার ব্যবস্থার কারণে, রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে তাই কৃষকও উৎপাদনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তার পণ্যকে বাজারে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে। এর ফলে ক্ষেতে যেমন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বেড়েছে তেমনি সেই পণ্য যখন বাজারে আসে তাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য তাতে কেমিক্যাল রং মেশানো হয়। ফল, শাক, সবজি টাটকা রাখতে মেশানো হয় ফরমালিন; ফল পাকাতে ব্যবহার হয় কার্বাইড। সবচেয়ে বিপজ্জনক যা তা হচ্ছে আমাদের দেশের কৃষক অধিকাংশই নিরক্ষর। তারা এসব রাসায়নিক দ্রব্যের মোড়কে কী লেখা থাকে তা অনেক সময় পড়তে পারে না, এসব দ্রব্য জমিতে কী পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তাও সঠিকভাবে জেনে ব্যবহার করে না। মূলত: দোকানী বা বিক্রেতার বা কোম্পানীর এজেন্ট এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবহার

করে। ফলে এসব রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষেতের অণুজীবের জন্য, অন্যান্য জীবের জন্য এবং মানুষের জন্য একেবারেই অনিরাপদ। শস্য ছাড়াও, মাছ, মুরগী, গরু-ছাগল সকল ক্ষেত্রেই এই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে প্রকৃতিতে নিরাপদ খাদ্যের সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে শুধু বাজার মনিটর করলে চলবে না। খাদ্যের উৎস যেখানে সেখানেও মনিটর জরুরী এবং কীভাবে এবং কোন নীতি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে এই খাদ্যের উৎসকে নিরাপদ রাখা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। কেননা মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীতে শুধু মানুষ বেঁচে থাকলেই হবে না, তার আশেপাশের সকল জীবের যারা কিনা প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করে ভারসাম্য বজায় রাখে তাদেরকেও বাঁচতে দিতে হবে। তাদেরও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে একথা পরিসংখ্যান আমাদের সামনে তুলে ধরে। যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষিমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ধান উৎপাদন হয়েছে ৩৬২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভূট্টা ৩৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন। গবাদি পশু উৎপাদন হয়েছে ৫৫৪.০২ লক্ষ, হাঁস মুরগী উৎপাদন হয়েছে ৩৪৪০.২২ লক্ষ। এছাড়া মাছ উৎপাদন হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে, চাষাবাদের মাধ্যমে এবং সামুদ্রিক উৎস হতে মোট ৪৩.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন।[৬]

সারণী ১ : খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০১১-২০১৮

খাদ্যশস্য	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
আউশ	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.৯০
আমন	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪
বোরো	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬
মোট চাল	৩৩৮.৯০	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬	৩৪৭.১০	৩৪৭.১০	৩৩৮.০৬	৩৬২.৭৯
গম	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১১.৫৩
ভূট্টা	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩
মোট	৩৬৮.৩৯	৩৭২.৬৬	৩৮১.৭৪	৩৮৪.১৯	৩৮৮.১৭	২৮৬.৯৬	৪১৩.২৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০১৯

উৎপাদন সন্তোষজনক থাকলেও যে প্রশ্ন সামনে চলে আসে যে, আমরা যা খাচ্ছি তা কি নিরাপদ খাদ্য? কারণ খাদ্য গ্রহণ করা হয় শুধুমাত্র পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং সুস্থ্য থাকার জন্য। আর সুস্থ্য থাকার সাথে খাদ্যের

সম্পর্ক নিবিড়। কারণ খাদ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য শরীরকে কর্মক্ষম রাখা। কিন্তু বর্তমান যে খাদ্য তার মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রিত হয়ে যায় এর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা প্রকারান্তরে খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায় এবং বিভিন্ন রোগের উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। নিরাপদ খাদ্যের ধারণা শুধুমাত্র খাদ্যবাহিত রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ খাদ্য নিরাপদ না হলে তাৎক্ষণিক অসুস্থ্যতা সৃষ্টির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী রোগের সৃষ্টি করে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অসংক্রামক রোগ বা ইংরেজিতে বলা হয় নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ, যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনী সমস্যা, লিভার সমস্যা, ক্যান্সার ইত্যাদি। খাদ্য নিরাপদ না হলে এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।[৭]

২০০৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্রিধান-২৯, যা কিনা কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় এক ধান, তাতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জিআই ৭০+ যা কিনা অন্যান্য ধানের তুলনায় অনেক বেশি।[৮] আরেকটি জনপ্রিয় ব্রিধান-২৮ এর জি আই প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। ধান গবেষকদের মতে জিআই বেশি এমন খাবার গ্রহণ করলে রক্তে গ্লুকোজ বা বিপির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। এর ফলে ডায়াবেটিস, কিডনী অকেজো হওয়ার মত রোগগুলো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।[৯]

আমরা দেখতে পাই যে, দেশের ফসল উৎপাদনে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৫০.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন সার ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ইউরিয়া ২৪.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন।[১০] নিচের সারণিতে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, কীভাবে প্রতিবছর এই সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী ২ ঃ রাসায়নিক সারের ব্যবহার ২০১১ - ২০১৮

অর্থবৎসর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএস পি	এনডিকেএস	এমওপি	এএসপি	জিপসাম	জিঙ্ক	অন্যান্য	মোট
২০১১-১২	২২৯৬.০০	৬৭৮.০০	৪০৯.০০	০	২০.০০	৬১৩.০০	৬.০০	১৫.০০	১২.০০	০.০০	৪০৪৯.০০
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	০	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪০২২.৫০
২০১৩-১৪	২৪৬২.০০	৬৮৫.০০	৫৪৩.০০	০	২৭.০০	৫৭৭.০০	৩.০০	১২৬.০০	৪২.০০	০.৪০	৪৪৬৫.৪০
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	০	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	০.০০	৪৭৯১.২২
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.০০	৫৩.৪৩	০.০০	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.০০	৫৭.৪৭	০.০০	৪২৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.০০	৭০৬.০০	৬৮৯.০০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫

উৎস : বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০১৯

বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি ক্রমশ: কমিয়ে এনে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব খাদ্য কি নিরাপদ এ প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। কারণ দেশের খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির পেছনে রাসায়নিক সার প্রয়োগ একটা বড় দিক। জমিতে নির্বিচারে সার দেবার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে একথা স্বীকৃত কিন্তু সাথে সাথে খাদ্যের গুণগতমান নষ্ট হয়েছে, স্বাদ গন্ধ বদলে গেছে, ফলে এসব খাদ্য নিরাপদ তা বলার মত জোর থাকেনা। কেননা খাদ্যের সঙ্গে আছে সুস্বাস্থ্যের সম্পর্ক । কিন্তু বর্তমান গ্রাম কিংবা শহর সব জায়গাতেই মানুষ নানান ধরনের পেটের অসুখ, গ্যাসের সমস্যা, হৃদরোগ-এর মত অসুখে ভুগছে। এমনকি এখন এসব রোগ যুব সমাজকেও আক্রান্ত করছে। আর ক্যান্সারের আক্রমণ বেড়েছে বহুগুণ। ঢাকা শহরে বড় বড় হাসপাতাল, ক্লিনিক তৈরি হয়েছে আর তাতে অসুস্থ্য রোগী উপচে পড়ছে। বহু সাধারণ মানুষ তাদের জমিজায়গা বিক্রি করে চিকিৎসা খরচ যোগান দিচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তা এইসব অসুখের ক্রমবৃদ্ধি দেখে অনুমিত হয়।

কৃষকের অ্যাপ

সরকারি সেবা জনগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "কৃষকের অ্যাপ" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ বানানো হয়েছে। স্মার্টফোনে ব্যবহার উপযোগী এই অ্যাপটি ব্যবহার করে কৃষকরা খুব সহজেই যে সেবাগুলো পাবেন, তা হচ্ছে-

ক. কম সময়ে, কম খরচে, ঘরে বসে ধান-গম সরাসরি বিক্রয়

খ. হয়রানি ও ভোগান্তি কমবে

গ. নিবন্ধন, বিক্রয়ের আবেদন, অনুমোদন, বরাদ্দের আদেশ এবং মূল্য পরিশোধের সনদ সম্পর্কিত তথ্য

ঘ. সরাসরি অভিযোগ দাখিল ইত্যাদি।

আগে ধান-গম বিক্রয়ের আবেদনের জন্য কৃষককে একাধিকবার খাদ্য অফিসে যেতে হতো, কিন্তু "কৃষকের অ্যাপ" পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরে বসেই ধান-গম বিক্রয়ের আবেদন করা যাবে। আর বরাদ্দের আদেশ জারী হওয়া মাত্রই মোবাইলে এসএমএস চলে আসবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭-এর ৯(ক) উপ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

"উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারী বিভাজন করবে; উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সরবরাহ করা মৌসুমে আবাদকৃত জমির পরিমাণ এবং সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণসহ ডাটাবেইজ হতে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। উপজেলা কমিটি প্রত্যেকের প্রদেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অর্ন্তভূক্ত কৃষকের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয় করা হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কোন কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম ক্রয় করা যাবে না।"[১১]

খাদ্য নিরাপত্তা প্রসঙ্গে যে বিষয়টা অবধারিতভাবে সামনে চলে আসে তা হচ্ছে মানব প্রজাতির খাদ্যের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রাণির খাদ্য নিরাপত্তা। বিশেষ করে কৃষির কথা যদি বলা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য অধিক উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষক মাটিতে নির্বিচারে প্রয়োগ করছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক এবং বালাইনাশক। যা মাটিতে থাকা লক্ষ কোটি অণুজীবের প্রাণকে বিপন্ন করছে, নিধন করছে। যে অণুজীব মূলত: গাছের খাদ্য তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রেখে থাকে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য শুধু মাটির অণুজীবের জন্যই হুমকি নয়, মাটির উপরে ক্ষেত খামারের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। জমিতে মাকড়সা, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, ফড়িং, কেঁচো, ছোট ছোট মাছ, পিঁপড়ে, পোকামাকড় এরকম প্রাণ রাসায়নিকের তীব্রতা সহ্য করতে পারে না, নিধন হয়ে যায়। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে অন্যান্য প্রাণীর নিরাপত্তাকে হরণ করা হচ্ছে। অথচ আমরা জানি যে, এসব প্রাণ একে অপরের খাদ্য। এখানে খাদ্য খাদকের একটা সম্পর্ক বিরাজমান। যা কিনা ক্ষেতের ইকোসিস্টেমকে বজায় রাখে। যদি পোকা মাকড় না থাকে তাহলে ব্যাঙ থাকবে না, ব্যাঙ না থাকলে সাপ থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। জমির পোকা মাকড় মাকড়সার খাদ্য। এতে অনেক ক্ষতিকর পোকা দমন হয়ে থাকে। কিন্তু মাকড়সা না থাকলে এসব পোকার বৃদ্ধি ঘটে। জীববৈচিত্রের কারণে প্রাকৃতিকভাবে যে ভারসাম্য রক্ষা হতো, তা নষ্ট হয়ে যায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে। এখানে তাই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে গিয়ে যে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, এক দিকে তা যেমন নিরাপদ নয়, অন্যদিকে তা অন্যান্য প্রাণীর খাবার ধ্বংস করে দিয়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা হরণ করছে সেই সাথে প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য হুমকির মধ্যে পড়ছে।

সারণী ৩ ঃ বাৎসরিক বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের ব্যবহার ২০১২-২০১৭

বছর	কীটনাশক			মাইটিসাইড miticide পরজীবীনাশক	ছত্রাকনাশক		উদ্ভিদনাশক	ইদুরনাশক Rodenticide	মোট
	দানাদার granular	তরল	পাউডার		সাধারণ	সালফার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১২	১৬৫৩৯.৩৫	৩৪৫৫.৪৬	৬৪১.৩৭	৫৫.২০	৩১৮২.৬০	২৩২৯৫.৯৪	২৬২৩.৯৪	৮৯.৮১	৪০৮৮২.৯৪
২০১৩	১৩৪৪৩.৪৪	৩৪৬২.৬৫	৬৯১.৩৪	৭১.৫৪	৩৫১৭.৯৬	১৩৫৩৬.৪৩	২৯৪৯.০৬	১০৮.৪৪	৩৭৭৮১.০৬
২০১৪	১১৭৪১.০০	২৮০২.২৫	৭৫৩.৭৩	৭৯.৩২	৩৫৭৫.০৫	১৩৪৬২.৩১	৩৪০০.২৯	৭৯.৭৩	৩৫৮০১.৬৮
২০১৫	১০১৩২-৪৮	৩৩১০.২১	৮২৩.৪৫	৮৩.২৮	৩৯৫০.৭৫	১০৯৪৫.৩১	৪০৫১.৩৩	৭৪.৭৯	৩৩৩৭১.৬০
২০১৬	১০১৩২.৪৮	৩৩১০.২১	৮২৩.৪৫	৮৩.২৮	৩৯৫০.৭৫	১০৯৪৫.৩	৪০৫১.৩৩	৭৪.৭৯	৩৩৩৭১.৬০
২০১৭	৭৩১৫.৮২	৪৫৬২.৭৩	১২৬৮.৬৯	১০৯.৪৮	৫৯০৪.৪৩	১০৩৫৪.১৭	৫৭৯৬.৬৯	৭৫.৩০	৩৭১৮৭.২৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ ক্রপ প্রটেকশন এসোসিয়েশন (BCPA) BBS, Yearbook of Agricultural Statistics 2017, Ministry of Planning, P.404

এতসব কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার সবই ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশের ক্ষেত খামারে। এর কিছু মাটিতে থেকে যাচ্ছে, কিছু আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। কারণ কৃষক কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকে এটা বলা যায় না। যা নিরাপদ খাদ্য প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসে।

ষাটের দশকের শুরুতে সবুজ বিপ্লবের ভিত্তি ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। সবুজ বিপ্লবে সহায়তা করেছিল উদার বাণিজ্যিকীকরণ নীতি। যা এদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে। যারা কিনা দেশের ৮৮% জনগোষ্ঠী ছিল। চ্যালেঞ্জ ছিল একারণে যে সে সময় থেকেই দেশের জনসংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান আর কৃষি জমি ক্রমহ্রাসমান। রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষি জমি প্রতিবছরই প্রায় ১% করে কমে যাচ্ছে। (জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮) মূলতঃ খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভেবেই সবুজ বিপ্লবকে বাংলাদেশে স্বাগত জানানো হয়েছিল। বিশেষ করে বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্যই কৃষিতে প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। যার মূল ক্ষেত্র ছিল কৃষিতে রাসায়নিকের এবং যান্ত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে দানাশস্যের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে 'ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট' এর নীতিতে এবং FAO এর সংজ্ঞা অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছে যে, তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকে যখন কিনা দেশের সকল জনগোষ্ঠী শারীরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। যে খাদ্য তাদের সক্রিয় এবং সুস্থ্য জীবনযাপনে সহায়ক। কিন্তু এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বুঝেছিলেন যে, মূলতঃ দানাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মোটা দাগে বলতে গেলে বলা যায় যে, যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ ভাত খায় সুতরাং ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে। ফলে উৎপাদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিকের ব্যবহার শুরু হয় কৃষি জমিতে, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, যে কোন নীতি গ্রহণ করার আগে জানা দরকার, যে উদ্দেশ্যে নীতি গৃহিত হতে যাচ্ছে তার চাহিদা কতটুকু। যেমন দানাশস্য কতটা উৎপাদন বৃদ্ধি করলে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর চাহিদা মিটবে তার মূল্যায়ন জরুরী। যে উৎপাদন ব্যবস্থা নেয়া হবে তা কতটা উদ্দেশ্য পরিপূরণ করবে। ২০০৭ সালে Hand book of Agricultural Statistics যে তথ্য-উপাত্ত আমাদের সামনে তুলে ধরে সেখানে এই প্রশ্নটা আরও বেশি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে যে, দানাশস্যে বাংলাদেশের চাহিদা কতটুকু এবং কতটা উৎপাদন করছি আমরা।

পরবর্তীতে বর্ণিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মোট খাদ্য চাহিদার যা পরিমাণ তার থেকে বেশি উৎপাদন হয় সেই ১৯৯৯ সাল থেকেই এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়। কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, বছর বছর খাদ্য আমদানী করা হচ্ছে। যার সুফল ব্যবসায়ীরা ভোগ করে থাকে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরও খাদ্য আমদানী করার ফলে বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। যোগান বেশি থাকার কারণে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমে যায়। কৃষক তার উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। কিন্তু শহরের মানুষ দাম কম থাকার কারণে সন্তুষ্ট থাকে, ব্যবসায়ী সমাজ ব্যবসার মাধ্যমে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত রাখে। তাতে দেশে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, কিন্তু

সারণি-১ বাংলাদেশের দানাশস্যের উৎপাদন এবং চাহিদার বিবরণী ১৯৯৯ - ২০১১

বছর	উৎপাদন	আমদানী	খাদ্যশস্য	সংখ্যা লক্ষ (০০০০০০) মেট্রিক টন			
				মোট প্রাপ্যতা	মোট চাহিদা	উৎপাদন উদ্বৃত্ত	মোট উদ্বৃত্ত
১৯৯৯-২০০০	২২১.৩	১২.৩	৮.৭	২৪২.৩	২১৪.৯	৬.৪	২৭.৪
২০০০-০১	২৩৭.৯	১০.৬	৪.৯	২৫৩.৪	২১৭.৭	২০.২	৩৫.৭
২০০১-০২	২৩০.৬	১২.৯	৫.১	২৪৮.৬	২২০.৯	৯.৭	২৭.৭
২০০২-০৩	২৬৮.৭	২৯.৭	২.৫	৩০০.৯	২২৩.৫	৪৫.২	৭৭.৪
২০০৩-০৪	২৭৬.৪	২৫.০	২.৯	৩০৪.৩	২২৫.৫	৫০.৯	৭৮.৮
২০০৪-০৫	২৬৪.৯	৩০.৯	২.৯	২৯৮.৭	২২৮.৬	৩৬.৩	৭০.১
২০০৫-০৬	২৭৭.৯	২২.৭	১.৯	৩০২.৫	২৩০.৩	৪৭.৬	৭২.২
২০০৬-০৭	২৮৯.৪	২৩.৩	০.৯	৩১৩.৬	২৩৩.৬	৫৫.৮	৮০.০
২০০৭-০৮	৩১১.২	৩২.০	২.৫	২৪৫.৭	২৩৬.৯	৭৪.৩	১০৮.৮
২০০৮-০৯	৩২৯.০	২৯.০	১.২	৩৫৯.২	২৪১.৭	৮৭.৩	১১৭.৫
২০০৯-১০	৩৪১.১	৩৪.৫	০.০৮	৩৭৫.৭	২৪৫.২	৯৫.৯	১৩০.৪৮
২০১০-১১	৩৭০.৪	৩০.০	১.৫	৪০১.৯	২৪৭.৪	১২৩.০	১৫৪.৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ ইকনমিক রিভিউ ২০১১ এবং হ্যান্ডবুক অব এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিসটিকস্, ২০০৭

কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কৃষকের সংগঠন না থাকা, নিরক্ষরতা, ক্ষমতাহীনতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতাহীনতা তাদের অবস্থানের বদল ঘটাতে পারে না । বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না । কৃষকের কণ্ঠ তাই এখানে সোচ্চার হতে পারে না ।



নিরাপদ খাদ্য ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আমরা প্রায়শ: খবরের কাগজে দেখি যে, জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা শহরের বিভিন্ন নামী দামী হোটেল-রেস্টুরেন্ট-এর ভিতরে অভিযান চালিয়ে ভেজাল, বাসি, পচা, খাবারে পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি, কেমিকেল রং মিশ্রিত নিম্নমানের খাবার বিক্রির অভিযোগে জরিমানা করছে বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্ট মালিককে এবং খাবার জব্দ করে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। কিছু নীতিহীন উৎপাদক, ব্যবসায়ী বেশি মুনাফার লোভে কিংবা না জানার কারণে বা অসাবধানতার বশে এরকম করে থাকে। ক্রেতাদেরও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান থাকে না হয়ত। এছাড়া কৃষিতে শাক-সবজি চাষে ইদানীং নানারকম বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয় এবং কীটনাশক ব্যবহারের যথাযথ নিয়ম মানা হয় না। অনেক সময় ফল দ্রুত পুষ্ট হবার জন্য গাছে হরমোন স্প্রে করা হয়, আবার ফল দ্রুত পাকানোর জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করা হয়। এই যে এত রকম, এত রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অনেক কেমিক্যাল আছে যা দীর্ঘমেয়াদী এমনকি রান্নার পরও নষ্ট হয় না। এসব খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত নয়। দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অণুজীবের মিশ্রণে দূষণ, রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে দূষণ এবং অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রণের ফলে শারীরিক দূষণ ঘটে।

নিরাপদ খাদ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা দুটিই পরস্পরের মধ্যে অন্তরিত। নিরাপদ খাদ্য বা Food Safety হচ্ছে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের বিষয়, নিরাপদ খাদ্য -এর সাথে সম্পৃক্ত সকল ধরনের খাদ্যের নিরাপদ উৎস। যে খাদ্য রাসায়নিক এবং অনুজীব দুষণমুক্ত, পোকামাকড় থেকে সুরক্ষিত, পচনশীলতা থেকে মুক্ত। সাম্প্রতিককালে বিশ্বে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি জটিল ইস্যু।

নিরাপদ খাদ্য ধারণাটি খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি প্রচুর খাদ্যের যোগান থাকে কিন্তু তা নিরাপদ নয় মানবের স্বাস্থ্যের জন্য তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন হয়েছে একথা বলা যাবে না। তাই নিরাপদ খাদ্য ধারণাটি আমাদের জীবন যাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিরাপদ খাদ্য এরকম একটা নিশ্চিত অবস্থা বোঝায় যা প্রত্যাশিত খাবারের জন্য ভোক্তার কোন রকম ক্ষতি করবে না। নিরাপদ খাদ্যের ধারণা খাদ্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা খাদ্য গ্রহণকারীকে সর্বোতভাবে নিরাপদ ও সুস্থ্য রাখবে। মোটা দাগে তাই নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত, ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায়। এরকম খাদ্য বিভিন্ন বয়স ও পেশায় নিয়োজিত নারী পুরুষ নির্বিশেষে এবং শিশু ও বৃদ্ধের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়। যে খাদ্য অপার কর্ম উদ্দীপনা ও সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর করে সুস্থ্য থাকাকে নিশ্চিত করে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা World Health Organization (WHO) নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন নীতি অনুসরণের নির্দেশনা দেয়।[১২]

- নির্ধারিত তাপমাত্রা ও সময়ের মধ্যে খাদ্য রান্না বা প্রস্তুত করা। যাতে খাদ্যে থাকা বিভিন্ন জীবাণু বা বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।
- সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষণ করা।
- ভেজালমুক্ত খাদ্যের সাথে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।
- স্যাঁতস্যাঁতে এবং ঠান্ডা জায়গায় বা কাঁচা জিনিসপত্র হতে রান্নাকৃত খাদ্যকে পৃথক রাখা।
- রোগাক্রান্ত বা স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত মানুষের স্পর্শ, গৃহপালিত পশুপাখি এবং বিষ হতে খাদ্যকে সুরক্ষা দেওয়া।

নিরাপদ খাদ্য নজর দেয় খাদ্য গুদামজাত করার প্রস্তুতি, এর যথার্থ ব্যবহারগত দিকগুলোকে। কারণ এসবই খাদ্যের কারণে যেসব অসুস্থতা হয় তাকে প্রতিহত করে। খামার থেকে সংরক্ষণাগার, সেখান থেকে বাজার এবং বাজার থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো- এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বিশুদ্ধতা, খাদ্য মান, বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ থেকে বিষমুক্ততা অর্থ নিরাপদ খাদ্য। খাদ্য পরিবহন, লেবেলকরণ, প্রস্তুতিকরণ, প্রসেসিং, রন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে দূষণ থেকে দূরে রাখা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য। এছাড়াও খাদ্য সঠিকভাবে আবৃতকরণ করা যাতে দূষিত না হতে পারে, বিশেষ করে যারা খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করে তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন, খাদ্যের স্বাদ বজায় রাখা এবং উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে নজরদারিকরণের মাধ্যমে খাদ্যের গুনগত মান বজায় রাখা। এসবই নিরাপদ খাদ্যের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যের প্রাপ্যতা বা ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিত হলেই খাদ্য নিরাপত্তা হবে তা নয় কারণ এর জন্যে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণও অপরিহার্য। কেননা এটা তো সর্বজনবিদিত যে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর নিরাপদ খাদ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুস্বাস্থ্য থাকার কারণ। নিরাপদ খাবার গ্রহণ করা এজন্যে জরুরী যে, এর সঙ্গে জড়িত জনস্বাস্থ্য, মানব শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। নিরাপদ খাদ্য পেতে হলে যা করতে হবে–

১. রোগ ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুর (ইস্ট, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) হাত থেকে খাদ্যকে মুক্ত রাখা ।

২. প্রাকৃতিক অথবা দূষণমুক্ত উৎস হতে সুষম ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে ।

৩. মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য গ্রহণ না করা ।

৪. সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা দরকার ।

৫. ভেজাল খাবার যাতে না গ্রহণ করতে হয় সেজন্য খাদ্য সরবরাহকারীর খাদ্যের গুণগতমান সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে ।

৬. বিশ্বখাদ্য সংস্থার (WHO) নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বিধি, উপবিধি যথাযথ অনুসরণ করতে হবে । একই ভাবে বাংলাদেশে যে নিরাপদ খাদ্য আইন তৈরি হয়েছে, তার নির্দেশনা সমূহও মেনে চলা দরকার ।

নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের ভূমিকা

পারিবারিক খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে পরিবারের সদস্যদের যেমন সচেতন হতে হয়, তেমনি জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে, নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় । এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হচ্ছে জবাবদিহীমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ । কারণ জনগণের সচেতনতা দ্বারা শতভাগ নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় না । এর কারণ সকল ক্ষেত্রে জনগণের অভিগম্যতা নেই ।

খাদ্য নিরাপদ রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারও যথেষ্ট মনোযোগী সে কারণে ২০১৩ সালে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সম্বলিত ও যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্যে "নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩" প্রণয়ন করা হয় এবং জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় ।[১৩] এই আইনে খাদ্য বলতে "চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন খাদ্যশস্য, ডাল, মাংস, মৎস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য তেল, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন সাধারণ পানি, বায়ুবাহিত পানি, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদি) সহ সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত, আংশিক প্রক্রিয়াজাত আহার্য্য উৎপাদন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণে বা কাঁচামাল যাহা মানবদেহের জন্যে উপকারী এরকম আহার্য্য বস্তু জীবনধারণ, পুষ্টিসাধন বা স্বাস্থ্যরক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।" আইনে সংক্ষেপে নিরাপদ খাদ্যের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে যে, "নিরাপদ খাদ্য অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য্য" । এই নিরাপদ খাদ্য আইনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্যে সরকার ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছে 'বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ' বা Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) । এছাড়া ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয় ।

নিরাপদ খাদ্য আইনে আরও বলা হয়েছে উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় বা বিপণনের যে কোন পর্যায়ে কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে উক্ত খাদ্যবস্তুতে উপস্থিত কোন বিশেষ বস্তু বা উদ্ভুত কোন অবস্থা, যাহাতে কীটনাশক ও বালাইনাশকের মূল উপাদান, সহযোগী অংশ, রূপান্তরিত উৎপন্ন দ্রব্য, বিপাক বা শোষণকৃত অবশিষ্টাংশ, বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু বা সৃষ্ট দূষিত বস্তুসহ এইরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে ও যাহাদের উপস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া সংঘটিত হয় বলিয়া বিবেচিত

হয়, এমন বিষয়গুলো আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। আইনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে - বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার অর্থাৎ খাদ্যে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক বা বালাইনাশক খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাবে না।

এই আইনে খাদ্যে ভেজালের জন্য ৫ বছরের কারাদন্ড ও ২০ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে বৈশ্বিক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশও যাতে একসঙ্গে চলতে পারে সেজন্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। বিশ্বের নিরীখে আমরা জনবহুল দেশ হিসাবে পরিচিত। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১০৩ জন।[১৪] মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব। আর সেজন্যে শিক্ষা, সচেতনতা, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য সংগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করা ব্যতীত মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, নিরাপদ খাদ্য প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন ও জনগণের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (CAB), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA), বারসিক (BARCIK), রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (RIB) সহ আরও সংগঠন জনসচেতনতা তৈরির জন্য তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগেও নিরাপদ খাদ্যের যোগান ও সচেতনতার প্রসারে কাজ করছে কিছু স্ব-উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ। দেশের বিভিন্ন অংশে তারা নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। চেষ্টা করছে জনগণকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের। তবে এসব খাদ্য কতটুকু নিরাপদ তার প্রত্যয়ন করার নিয়ম এখনও যথাযথভাবে চালু হয়নি। এ ব্যাপারে আরও সমন্বিতভাবে কর্ম উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কৃষকের ঘর হলো প্রথম স্তর। এজন্যে কৃষকদের সচেতন করা যাতে জৈব সার প্রয়োগ এবং প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত বালাইনাশকের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করা যায়। সরকারকে এ ব্যাপারে পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে যাতে কৃষক তার উৎপাদিত নিরাপদ পণ্য বিক্রি করতে পারে।

নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত খাদ্য নিরাপত্তা। FAO-র খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনও কাঙ্খিত মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পেরেছে একথা দাবী করা যাচ্ছে না।[১৫] খাদ্য নিরাপত্তা দ্রুত নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ১৭টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেগুলো হচ্ছে– ১. ফসলের উৎপাদন খরচ কমানো ২. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ৩. আবাদি জমি বাড়ানো ৪. প্রাকৃতিক দূর্যোগ সহনশীলজাত উদ্ভাবন ৫. জলবায়ু পরিবর্তন উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ৬. আন্তঃফসল, মিশ্র ফসল, রিলে ফসল চাষ করা ৭. সেচের জমি বৃদ্ধি করা ৮. উফসী ও হাইব্রীড ফসল চাষ করা ৯. শস্য বহুমূখীকরণ করা ১০. জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও প্রচুর চারা উৎপাদন করা ১১. রোগবালাই দমন করা

১২. প্রতি ইঞ্চি জমি চাষ করা ১৩. ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পুকুরে মাছ মুরগি হাঁসের সমন্বিত চাষ করা ১৪. রোগ ও পোকা দমনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা ১৫. সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া ১৬. শস্য বীমা চালু করা ১৭. কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সংরক্ষণগার বাড়ানো। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, পেশা, কৃষক, শ্রমিক, কৃষি কর্মী সবাইকে একত্রে কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে কাজ করা দরকার।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার একই সঙ্গে হাইব্রীড এবং উফসী বীজ ব্যবহার করার কথা বলছে আবার জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বলছে। এর কারণ হচ্ছে, সরকারের চিন্তা আছে দেশের মানুষের কাছে খাদ্য সরবরাহ করা সেজন্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যা কিছু করার দরকার তা করার কথা বলা হচ্ছে। আর এই অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে জমি, মাটি ক্রমশ: নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা জরুরী। সুতরাং সরকারী নীতিতে এই দুই পদ্ধতিই গৃহিত হয়েছে।

নগরীতে নিরাপদ সবজীর হাট[১৬]

নিরাপদ খাদ্যের প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ হচ্ছে রাজধানীতে নিরাপদ সবজীর হাট। গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সেচ ভবনে সরাসরি কৃষকের দ্বারা বাজারজাত করা নিরাপদ সবজীর হাট বসে সাপ্তাহিক হাট হিসাবে। নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই হাটের আয়োজন শুরু হয়। এই হাটে যেসব কৃষক তাদের নিজস্ব উৎপাদিত সবজি নিয়ে এসেছিলেন সেইসব কৃষক এবং তাদের ক্ষেতখামার গত একবছর ধরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। যারা মূলত: জৈব সারের মাধ্যমে তাদের ফসল উৎপাদন করে থাকে। সেখানে স্বাস্থ্য হানিকর রাসায়নিক সার বা কীটনাশক বিষ ব্যবহার করা হয়নি, বলা চলে নিরাপদ ফসল।

এই হাট আগামীতে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার চিন্তাভাবনা চলছে। উদ্বোধনকালে কৃষি মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি উপজেলায় দুটি করে গ্রামকে নিরাপদ সবজীর গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলার বাজারে একটি করে নিরাপদ সবজী কর্ণার থাকবে যেখানে চাষী নিরাপদ সবজী বিক্রি করবে। এতে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবে। এই বাজারে ফসলের মানের তদারকি করে থাকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রীর বক্তব্যে আরও জানা যায় যে, বিএডিসি আশি হাজার কন্ট্রাক্ট ফার্মারের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও সরকার পারিবারিক খামারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশে মোট পরিবারের সংখ্যা ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার একশত আশি। এর মধ্যে কৃষি পরিবারের সংখ্যা এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাষট্টি হাজার নয়শত চুয়াত্তর। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৩.৩১% এই কৃষি খাত থেকে অর্জিত হয়।[১৭] এসব কৃষি পরিবার নিজসহ অন্যান্য অকৃষি পরিবারে খাদ্য যোগান দেয়। বলা হয়ে থাকে আবাদী জমি প্রায় ১% হারে কমছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ১.৩৭% হারে। সরকারের উদ্দেশ্য ক্রমহ্রাসমান জমি থেকেই পারিবারিক খামারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করা। এ লক্ষ্যে একটি জনপ্রিয় কর্মসূচি হচেছ একটি বাড়ি একটি খামার। এই কর্মসূচিতে পরিবারেই খাদ্যশস্য, শাকসবজী, ফলমূল, মাছ, ডিম, গোশত, দুধ ইত্যাদি খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ থাকবে। এর সঠিক বাস্তব চিত্র পাবার জন্য ডিটেইল তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষণা প্রয়োজন।



খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক খাদ্য রাজনীতি

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই প্রকৃতি উদারভাবে তার সম্পদের মালিকানা ভোগ করতে দিয়েছে স্থানীয়ভাবে সকলকে। কিন্তু মানুষ তাকে নিজের দখলে নেবার আগ্রাসনে ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে যেতে চায়। জ্ঞান হচ্ছে শক্তি, কিন্তু এই জ্ঞান যেমন মানুষের জীবন রক্ষা করে তেমনি ধ্বংসও ডেকে আনে। উন্নত দেশগুলো এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করে - তা ভৌগলিকভাবে কিংবা লোকজ সম্পদ ও জ্ঞান দখলের মাধ্যমে। যার সাথে জড়িয়ে আছে জীববৈচিত্র্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব।

ঐতিহাসিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উপনিবেশবাদের অধীনে ছিল বহু বছর। ফলে এধরনের অধনস্ততা তৈরি করা হয়েছে কাঠামোগতভাবে। যেখানে জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়ে থাকে। সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যুক্ত করে এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তৈরী করা হয়ে থাকে, যার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। যা কিনা অনেক সময় আমাদের চেতনাতেও ধরা পড়ে না। কিংবা ধরা পড়লেও প্রযুক্তিহীনতা এবং অজ্ঞানতার ফলে আমরা উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতিকেই নিজেদের মধ্যে ধারণ করি চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন সাহায্য সহায়তার মাধ্যমে। কারণ এই প্রবল সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা বা প্রতিরোধ করার মত জ্ঞান, অর্থ উন্নয়নশীল বিশ্বের থাকে না। ফলে মেনে নিতে বাধ্য হয় এসব দেশগুলো। উপনিবেশবাদের এ এক ভিন্ন প্রক্রিয়া।

প্রাণ উপনিবেশিকরণ

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উন্নত দেশগুলোর বহুজাতিক কর্পোরেট গোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশের কৃষিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকাঠামোকে কুক্ষিগত করার তাগিদে উদ্ভিদ, প্রাণ, বীজ, জিন ও হারবাল মেডিসিনের মেধাস্বত্ত্ব আদায়ের জন্যে প্রচুর বিনিয়োগ করে থাকে। এই কর্মকান্ড থেকে শুধু কোম্পানীই লাভবান হয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এসব জেনেটিক বা প্রাকৃতিক সম্পদের মূল মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী হলেও তাদের স্বার্থ স্বীকৃত হয় না, তারা প্রতারণা এবং বঞ্চনার স্বীকার হয়। তাদের নিজ সম্পদের উপর কোন মালিকানা থাকে না, তাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশগুলোর হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী জেনেটিক সম্পদ ও স্থানীয় জ্ঞান কাঠামোর এই লুণ্ঠনকেই প্রাণ-উপনিবেশীকরণ বা বায়োকলোনিয়ালিজম বলা হয়।[১৮] উপনিবেশী- করণের ক্ষেত্রে এক দেশ অন্য দেশের ভূমি দখল করে। প্রাণ উপনিবেশীকরণে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোর প্রাণবৈচিত্র্য, উদ্ভিদ, প্রানী, অনুজীব, শস্যবীজ এমনকি জীন পর্যন্ত দখল করে নেয়। এই লুণ্ঠনের গভীরতা চোখে দেখা যায় না, অনুভূত হয়।

এই প্রাণ উপনিবেশীকরণ - এর পেছনে কাজ করে দুটি প্রক্রিয়া। এক: প্রাণ ও জীবসম্পদের যেমন: বীজ, উদ্ভিদ, প্রাণী, অনুজীব, জিন পণ্যকরণ ও বানিজ্যিকীকরণ; এবং দুই: প্রাণ ও জীব সমূহের বানিজ্যিকীকরণকে ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববানিজ্য সংস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ।

বায়োকলোনিয়ালিজমে আমরা দেখতে পাই জীবসত্ত্বাকে (প্রাণের যে কোন প্রকাশ যেমন, জিন, জেনেটিক সম্পদ, উদ্ভিদ, প্রাণী, কোষ) বিশ্বায়নের ধারণা,আধুনিক রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদের ধারণার সাথে যুক্ত করে জীবসত্ত্বা সম্পর্কিত ধারণাকে পাল্টে দেওয়া হয়। সেই সাথে জীবসত্ত্বাকেও পণ্যকরণ ও বানিজ্যিকীরণ করে বৈশ্বিক পুঁজির কাঠামোর সাথে একীভূত করা হয়। এর ফলে জীবসত্ত্বাও এখন দখলের বিষয় হয়ে গেছে। বিশেষ করে প্যাটেন্ট বা মালিকানার লড়াইয়ে কর্পোরেট গোষ্ঠী এমন সক্রিয় যে, কে কত জীবসত্ত্বার মালিকানার অধিকারী তার প্রতিযোগিতা চলে। এর নগ্ন প্রকাশ দেখা যায় WTO বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ট্রিপস চুক্তির ২৭.৩ ধারায়, যেখানে প্রাণ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপর পেটেন্ট করার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। নিও-লিবারেল অর্থনীতি এসবের ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ছায়ায় বিশ্ববানিজ্য সংস্থা (WTO) মূলত: সারাবিশ্বে একমাত্রিক বানিজ্য নীতি চালু করতে চায়, যা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। তারা গ্লোবাল কর্পোরেট বানিজ্য নীতির আওতায় (General Agreement on Trade in Services) উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে আসতে চায়।[১৯]

১৯৯০ সাল থেকেই বিশ্ববানিজ্য সংস্থাকে নিওলিবারেল নীতির মাধ্যমে হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য কৃষি খাতকে বৈশ্বিকভাবে উদারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং কৃষি সংস্কারের নামে রাষ্ট্রের সংরক্ষণশীল নিয়মকানুনকে সরিয়ে বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দেশীয় কৃষির উৎপাদন ব্যয়বহুল করা এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত করা। যেমনটি দেখা যায় ধানবীজ, পাটবীজ, টমেটো, ফুলকপি বীজের ক্ষেত্রে। আমাদের দেশজ বীজসমূহ লুপ্ত হয়ে যাবার পেছনের কারণ হিসাবে বহুজাতিক কর্পোরেট গোষ্ঠীর বানিজ্যকে চিহ্নিত করা হয়।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাধ্য করা হচ্ছে কোম্পানীর হাইব্রীড এবং জিএমও শস্য চাষ করতে। এসব কোম্পানী দাবী করছে যে এসব বীজ বিশেষ করে জিএমও শস্য চাষ কীটনাশকের ব্যবহার কমাবে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর হবে। এর বিপরীত মতবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্ববানিজ্য সংস্থার এই আধিপত্যবাহী কাঠামোর মধ্যে উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও ছোট ছোট খামারের বিলুপ্তি ঘটাবে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এবং কৃষকদের নিজস্ব উৎপাদনশীলতাকে ধ্বংস করার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হবে।

এসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের যাবতীয় আধিপত্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের মাধ্যমেই পরিচালনা করে থাকে। এরা বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে গ্লোবাল পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং রাষ্ট্র মূলত নিজেই কর্পোরেট বডি আকারে ফাংশন করে থাকে। ম্যাক মাইকেল এর মতে[২০] "খাদ্য উৎপাদন ও ভোগে বৈচিত্রের বদলে মনোকালচার প্রবর্তন করে খাদ্য উৎপাদন ভোগে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। এসব কোম্পানী বাস্তবে স্থানীয় কমিউনিটি কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণাকে বাদ দিয়ে নিও লিবারেল অর্ডার প্রবর্তন করে। এর ফলে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এসব ধারণার জায়গা দখল করে নিয়েছে কর্পোরেট গোষ্ঠীর খাদ্য ব্যবস্থা। তাই তো দেখা যায় যে বৈশ্বিক অর্থনীতির ৬৫% হচ্ছে কৃষি এবং ১০ টি বহুজাতিক এগ্রো কেমিক্যাল কোম্পানী কৃষি নির্ভর ব্যবসার ৮১% এবং সারা পৃথিবীর সামগ্রিক বীজ বাজারের ৬৪% নিয়ন্ত্রণ করে।"

প্রযুক্তি এবং বায়োপাইরেসি

প্রবল রাষ্ট্রগুলো নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে সম্পদ যেমন সৃষ্টি করে তেমনি প্রযুক্তিকে সম্পদ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করে থাকে। আর সেটা করে থাকে আইনী আধিপত্যের মাধ্যমে। পেটেন্ট আইন এমনই একটি আইন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি রাষ্ট্র পেটেন্ট আইন এবং বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার বানিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার আইনের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশগুলো এই আগ্রাসনের শিকার, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। গত দুই দশক ধরেই মনসান্তো, ইউনিলিভার, ডুপন্ট, বায়ার ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বের লোকজ জ্ঞান, প্রাণ বৈচিত্র্য তথা জেনেটিক সম্পদকে আইনের মাধ্যমে পেটেন্ট করে নিয়ে তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার ট্রিপস (TRIPS) চুক্তির ২৭.৩ (খ) ধারা এ ধরনের পেটেন্ট আগ্রাসনের সুযোগ করে দিয়েছে। TRIPS চুক্তি অনুসারে জিনের পেটেন্ট দাবী করতে পারবে শুধু সরকার ও কর্পোরেশন - কৃষকরা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই দাবী করতে পারবে না এবং এই চুক্তিতে লোকজ জ্ঞানের উপর কৃষক ও কমিউনিটির প্রাকৃতিক অধিকারেও কোন স্বীকৃতি নেই।

এই চুক্তির সহায়তা নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে শস্য বীজ সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছে বিশাল বীজ ব্যাংক। এরপর সেসব শস্যের জিনোম সিকোয়েন্স নির্ণয় করে যে জিনটি ঐ শস্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী তা আবিষ্কার করে তার মৌলিকত্ব দাবী করে। অথচ দেখা গেছে যে, বহু আগে থেকেই স্থানীয় কৃষকরা ঐ শস্যের বীজের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন করে থাকে প্রাকৃতিকভাবে। স্থানীয় কৃষকদের কাছে

যার মালিকানা আগে থেকেই ছিল তাকে কোম্পানীগুলো ল্যাবরেটরীতে প্রযুক্তির মাধ্যমে সনাক্ত করে নিজস্ব মালিকানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় । এসব কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যেকার যে বৈচিত্র্য, বিভিন্ন জাত ও বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু কৃষকদের নিয়মিত চাষাবাদের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল, অথচ কোম্পানীগুলো কৃষকদের এই হাজার বছরের শ্রম, উৎপাদন পদ্ধতিকে শুধুমাত্র জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থের সমন্বয়ে যে ক্ষমতা তার ভিত্তিতে নিজস্ব উদ্ভাবন বলে দাবী করে । এভাবেই তৃতীয় বিশ্বের কৃষক ও জনগণের স্থানীয় শস্য বীজের জাত বেদখল হয়ে চলে যায় বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকানায় । এটি এক ধরনের চৌর্য্যবৃত্তি যা এসব কোম্পানী ভদ্রভাবে, জ্ঞানের, প্রযুক্তির এবং অর্থের মাধ্যমে নীরবে সংঘটিত করে থাকে । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ বাংলাদেশের ওষধি নিম গাছ হতে প্রাপ্ত ছত্রাক বিরোধী ওষুধের পেটেন্ট নিয়ে নিয়েছে । একইভাবে পাকিস্তান ও ভারতের বাসমতি চালের উপর যুক্তরাষ্ট্রের রাইসটেক কোম্পানী মালিকানা দাবী করছে । এ ধরনের কাজগুলো খুব সংগঠিতভাবে করে যাচ্ছে ডুপন্ট, মনসান্তোর মত কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলো । বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এই ধরনের আগ্রাসনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এখন এসব বিষয়ে জানে কিন্তু কিছু করতে পারছে না কেন এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক । প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের মত দেশগুলোর কর্মকর্তারা এসব আগ্রাসনকে যে মেনে নেয় তার পিছনে কাজ করে সুগভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ।

অজ্ঞানতার ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে কোন আবিষ্কারকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কোন নিরীক্ষা ছাড়াই সাদরে বরণ করে । এভাবেই আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তার নামে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি এসেছে । বর্তমানে এসেছে জি এম প্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মত বিষয়গুলো । এসব প্রযুক্তির টেস্ট কেস হিসাবে আমরা ব্যবহৃত হই গিনিপিগের মত । জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি থেকে সরে গিয়ে আমরা মনোকালচার কৃষিতে পরিবর্তিত হয়ে যাই ।

বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত শস্য বীজের প্রসারে পশ্চিমা দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জোরে শোরে কাজ করছে, বাংলাদেশও এর বাইরে নয় । বহুজাতিক এগ্রো-কেমিক্যাল কর্পোরেশনগুলো জি এম প্রযুক্তির উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে কারণ এর মাধ্যমে পেটেন্ট আগ্রাসনের মাধ্যমে কৃষি বীজের উপর কোম্পানীর একক কর্তৃত্ব এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সহজেই । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে এসব কোম্পানী বিভিন্ন দেশের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে । আর উন্নয়নশীর বিশ্বের কর্ণধারগণ এই সম্পর্কের যোগসূত্রতা সম্পর্কে যদি ওয়াকেবহাল না থাকে তাহলে সহজেই এসব দেশগুলো বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে যায় । প্রযুক্তি বিনিময়ের অন্তরালে পরিচালিত হয় ক্ষমতার আগ্রাসন, যাকে বলা হয়ে থাকে বায়োপাইরেসি । এসব কোম্পানী যখন বায়োপাইরেসির মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যগত শস্য বীজের মালিকানা দাবী করে তখন তাকে সরলভাবে দেখার কোন অবকাশ থাকে না, তাকে আর নির্মোহ বিজ্ঞান বলা চলে না ।

বাংলাদেশও এই পেটেন্ট আগ্রাসনের অন্তর্ভূক্ত একটি উন্নয়নশীল দেশ । বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সংস্কৃতিক সম্পদ, কৃষিজ পণ্য ও প্রাণ বৈচিত্র্যের উপর মেধাস্বত্ত্ব অধিকারের নামে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। ওষধি নিম গাছের স্বত্ত্ব নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথাকে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে ভারত বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার কাছে এর মালিকানা দাবী করে রেখেছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বেগুনের নয়টি জাতকে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত করে এসব বীজের মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মনসান্টো কোম্পানী।[২১] বিশ্বব্যাপী বীজ নিয়ে যে রাজনীতি চলছে তার শিকারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের কৃষি ও প্রাণবৈচিত্র্য। ব্যাসিলাস লুরিনজেনসিস (বিটি) বেগুন চাষের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং চাষ হচ্ছে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জি এম) ধান গোল্ডেন রাইস চাষের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ এখন বহুজাতিক এগ্রোকর্পোরেশনের বানিজ্যের একটা উর্বর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এভাবে ক্রমশ: কৃষিতে বীজ আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের বীজ বৈচিত্র্যকে হুমকীর সম্মুখীন করে তুলেছে।

ফলন বৃদ্ধির নামে বীজ মালিকানা দখল করার এটি একটি প্রক্রিয়া। ২০০৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), মনসান্টোর পক্ষে ভারতের মহারাষ্ট্র হাইব্রীড সীড কোম্পানী লিমিটেড ও ভারতীয় কোম্পানী সাতগুরু ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর মধ্যে যে ত্রিপক্ষীয় সাব লাইসেন্স চুক্তি সাক্ষরিত হয়, তাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে এই বিটি বেগুনের বীজের মেধাস্বত্ত্ব মনসান্টো-মাহিকো কোম্পানীর (ধারা ১.১৯) এবং তা বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে (বারি) কিনে নিতে হবে কোম্পানী থেকে (ধারা ১.৬)। চুক্তির ধারা ৯.২ (গ) তে বলা হয়েছে:[২০]

"বিটি বেগুন বীজের ও প্রযুক্তির বানিজ্যিক ও মেধাস্বত্ত্ব অধিকারের সংরক্ষণ লঙ্ঘিত হলে কোম্পানী এই চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে।"

চুক্তির এসব শর্ত স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, বাংলাদেশের বেগুন বীজের মালিকানা এখন মনসান্টো-মাহিকোর কাছে। এটা বায়ো-পাইরেসি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের হাজার বছরের লোকজ জ্ঞান, বীজ, সম্পদসহ সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশ: কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। একইভাবে সিনজেনটা এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মধ্যেও গোল্ডেন রাইস প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানেও একই চিত্র ধরে নেওয়া যায়।

সরকারের পক্ষ থেকে বিটি বেগুন চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষক যদি ধানের মত এই বেগুন বেশি ফলনের আশায় করতে থাকে তাহলে আমাদের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখা কঠিন হবে। কারণ জি এম বীজ লোকজ বীজগুলির যে সমস্ত জাত আছে তার জায়গা দখল করে নেবে, লোকজ বীজগুলো হারিয়ে যাবে। এর ফলে বীজ নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা চলে যাবে প্রাইভেট কর্পোরেশনের হাতে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বিটি বেগুনের জিন বাংলাদেশের নিজস্ব অন্য জাতের বেগুনে প্রবেশ করলে এসব জাত জেনেটিক দূষণের কবলে পড়বে।

বায়োপাইরেসী বা প্রান উপনিবেশীকরণের ফলে লোকজ জ্ঞান ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা বেদখল হয়ে যায়। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব হারিয়ে কর্পোরেট গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতা

এসব বহুজাতিক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে আমাদের মত দেশের শস্য বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে যায়। বীজের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়, কারণ বীজের মালিকানা এসব গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

উন্নয়নশীল দেশের ঐতিহ্যগত কৃষ্টি সংস্কৃতির সাথে, জীবনযাপনে খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে জারী সারী, ভাটিয়ালী গান, বিয়ের গান, শস্যের বপন, শস্য ঘরে তোলা ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান তৈরী হয়েছে। যা আমাদের জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। যা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং নিজস্বতাকে পরিচয় দান করে। কিন্তু এসবই ক্রমশ: হারিয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমাদের কৃষির পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন শুধুমাত্র ভোগের বিষয় নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি কৃষির উৎপাদন পদ্ধতির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ বাইরের কোন গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। নয়া উদারতাবাদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, স্থানীয় ইকোসিস্টেম এবং লোকজ জ্ঞান কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে পেটেন্টকরণের মাধ্যমে আমাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং মালিকানা কর্পোরেট গোষ্ঠীর কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দিয়েছে।





বিকল্প প্রেক্ষিত : খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্যের অধিকার হচ্ছে মানুষের একেবারেই এক মৌলিক অধিকার। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর খাবার ধরন সমতলভূমির বাঙালীদের থেকে ভিন্ন। এই অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার নিজস্বতা, তার কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি। একেক এলাকার মানুষের খাদ্যাভাস একেক রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘদিনের চর্চ্চায় তা প্রবাহমান। সেখানে আছে তার স্বতন্ত্র, তার স্বকীয়তা। তার নিজের সক্ষমতায় এবং তার এলাকার প্রাপ্য খাদ্যের ভিত্তিতে এই স্বকীয়তা গড়ে ওঠে। সেজন্য আমরা দেখি বাংলাদেশের একেক এলাকার খাদ্যাভাস একেক রকম। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ তাই তার নিজস্বতাকে নিয়ম মেনে চলে। সেখানে অন্যের আধিপত্য কিংবা অন্যের ফরমায়েশ অনুসারে খাদ্য গ্রহণে তার রয়েছে প্রবল অনাপত্তি। চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মানুষ শুটকি মাছ খাওয়াকে তার দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অংশ মনে করে, যা যশোর খুলনার জন্যে হয়ত প্রযোজ্য নয়। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর খাবার ধরন সমতলভূমির জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিন্ন। এই যে নিজের মত করে খাওয়া এবং তার মাধ্যমে জীবন ধারণ, এটাই তার সার্বভৌমত্ব। একেক এলাকার মানুষ একেক ধরনের চালের ভাত খেতে অভ্যস্ত। কেউ আতপ চালের ভাত খায়, কেউ একসিদ্ধ চালের ভাত, আবার কেউ সিদ্ধ চালের ভাত খায়। এই যে বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্র এটাই তার খাদ্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে। আবার খাদ্য বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে টিকে থাকে। যে কারণে আমরা নবান্ন উৎসব করি, বিভিন্ন পূজা পার্বনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাই

অনুষ্ঠিত হয় বাহান্নো রকম পদের রান্না নতুন বছরের বৈসাবি উৎসব ঘিরে। বিয়ে, মেজবান অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকা তাই ভিন্ন। এসবই সম্ভব হয় কারণ এসব এলাকার কৃষক তাদের নিজেদের খাদ্য নিজে উৎপাদন করে এবং খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই যে প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকা, টিকে থাকাকে নিশ্চিত করে। এটা করে জীবনের তাগিদে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নয়। এই মূল্যবোধ থেকে যে খাদ্য উৎপাদন করা হয় তার সাথে মুনাফার কোন সম্পর্ক নেই, বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক নেই, এই ধারণাই মূলত: খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণাকে নির্দেশ করে।

দেশের জনগণের পুষ্টিচাহিদা মিটিয়ে পর্যাপ্ত খাবারের যোগানকে খাদ্য নিরাপত্তা হিসাবে অভিহিত করা হয়। মূলতঃ চাল ও গম জাতীয় দানাশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন ও মজুদ থাকাকেই খাদ্য নিরাপত্তা মনে করা হয়। তবে মজুদ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আছে কিনা এবং সুষম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান কিনা এর উপর নির্ভর করে খাদ্য নিরাপত্তা। প্রচুর খাদ্য উৎপাদন হলেই শুধু হবে না, খাদ্য কেনার মত জনগণের ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে। ক্রয় ক্ষমতা তখনই বাড়বে যখন আয় বৃদ্ধি হবে। আবার দেখা যায় যে, খাদ্য মজুদ হয়তো আছে, বন্টনেও কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যে খাবারটা আমার সংস্কৃতির অঙ্গ কিংবা যে খাবারটা আমার ঐতিহ্য সেই খাবারের কোন যোগান নেই। এর অর্থ আমার খাদ্য সার্বভৌমত্ব নেই, যেমন বাজারে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ চিপস আছে, কিন্তু কোন মোয়া, মুড়কি, মুড়ি, চিড়ে, পিঠে যা কিনা আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তা নেই। অর্থাৎ বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে অন্যের দ্বারা বা সহজ কথায় কোম্পানীর দ্বারা (যাদের আবার অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানী)। তাহলে কি বলা যাবে যে আমার পছন্দমত খাদ্য খেতে পারছি নাকি বাধ্য হচ্ছি অন্যের পছন্দের খাবার খেতে। এখানেই আমার খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন এসে যায়। সার্বভৌমত্ব শুধু ভূ-খন্ডগত নয়, সার্বভৌমত্ব সংস্কৃতির, সার্বভৌমত্ব খাদ্যের। যদি বলা হয় যে, বাংলাদেশ ছানার সন্দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু দেশকে ছানা তৈরীর জন্য দুধ এবং চিনি আমদানী করতে হয়। তাহলে বলা যাবে না এখানে খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, নীলফামারী ও বগুড়া জেলায় মাঠ পর্যায়ের কাজে যখন যাওয়া হয় তখন স্থানীয় দোকানে গিয়ে মুড়ি বা চিড়ার মোওয়া কিনতে গিয়ে হতাশ হতে হয় কারণ দোকানীর সোজা উত্তর - এসব দ্রব্য দোকানে নেই। তবে দোকানের সামনে আছে মালার মত সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন কোম্পানীর বাহারী চিপসের প্যাকেট। মা- বাবারা বাচ্চার আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাভূত হয়ে, কিংবা সুলভ বলে, কিংবা অসচেতনতার কারণে প্রতিদিনই এসব চিপসের প্যাকেট বাচ্চাদের কিনে দিচ্ছেন। প্যাকেটের চিপসের খাদ্য মান কিংবা পুষ্টি কিংবা বাতিলের তারিখ- এসব কিছুই নজরে আনছেন না। এর ফলাফল কি হচ্ছে সে নিয়ে গবেষকরা কাজ করতে পারেন। আপাতঃদৃষ্টিতে যা হচ্ছে তা হলো শিশুর পেটের পীড়া, গ্যাস সহ দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখানে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য কিংবা খাদ্য সার্বভৌমত্ব এই তিনের কোনটাই কাজ করে না।

'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' শব্দটি ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বখাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে ব্রাজিলের লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনার সদস্যরা প্রথম উত্থাপন করে। যার মূল কথা হচ্ছে নিজস্ব এলাকার উৎপাদিত খাবারের উপর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব তুলে ধরা। সাধারণ মানুষের এই মূল্যবোধ এবং এই সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে বৈশ্বিকভাবে যারা খাদ্যকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। খাদ্যকে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে, তাদের ক্ষমতার বলয় প্রবল এবং বিশ্বব্যাপী। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রান্তিকতায়

পর্যবসিত হয়ে যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপট সেটাই নির্দেশ করে। এর শুরু সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে কাঠামোগত রূপ লাভ করে। এই সামগ্রিক আধিপত্যের বিপরীতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী মালি'র সেলিঙ্গা (Selingue) নামক স্থানে বিশ্বের ৮০টি দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি একত্রিত হয় এক সম্মেলনে। সেখানে তারা একত্রিত হয়ে নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করা এবং খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার অধিকারকে ভিত্তি করে 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' ধারণাকে বিকশিত করার প্রয়াস নেয়। যেখানে খাদ্য সার্বভৌমত্বের আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই ধারণাকে সুসংহত করা ও কৌশলগত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেলিঙ্গার নাইলিনি (Nyeleni) গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। সেখানে বিভিন্ন আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সবাই একমত হয়ে নাইলিনি ঘোষণা করে। যা নাইলিনি ঘোষণা ২০০৭ হিসেবে স্বীকৃত। এখানে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, "খাদ্য সার্বভৌমত্ব হলো স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের অধিকার। যে খাদ্য হবে পরিবেশসম্মত ও টেকসই উপায়ে উৎপাদিত। খাদ্য সার্বভৌমত্ব বাজার বা কোম্পানীর স্বার্থ পূরণ না করে বরং যারা খাদ্য উৎপাদন, বিতরণ এবং সেই খাদ্য যারা গ্রহণ করে থাকে তাদের স্বার্থকেই কেন্দ্রে রাখে। যা কিনা বংশ পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মকে সংযুক্ত করে ভোক্তার স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় এবং অগ্রাধিকার প্রদান করে।"

নাইলিনি (Nyeleni) ঘোষণা-২০০৭ অনুযায়ী খাদ্য সার্বভৌমত্বের ছয়টি মূল ভিত্তি হলো :[২২]

ক. খাদ্য সর্বাগ্রে মানুষের জন্য: সংশ্লিষ্ট যে কোনো নীতিমালায় মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া এবং খাদ্যশস্যকে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মতো ভোগ্যপণ্য (Commodity) হিসাবে বিবেচনা না করা।

খ. খাদ্য উৎপাদকের যথাযথ মূল্যায়ন করা: খাদ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রান্তিক কৃষকের শ্রম-ঘাম-মেধা-জ্ঞানের মূল্য দেওয়া এবং তাদের খাদ্য উৎপাদনের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া।

গ. চাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে খাদ্য উৎপাদন করা: খাদ্য উৎপাদক ও খাদ্য গ্রহণকারী ভোক্তার মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে স্থানীয় ভোক্তার জন্য স্থানীয় ভাবে খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া। এতে ভোক্তার পক্ষে উৎপাদিত খাদ্যের মান জানার সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি খাদ্য নিয়ে যে কোন প্রকার চুক্তি ও নীতিমালা যা কর্পোরেট বা অসাম্য বাণিজ্য তৈরি করে তা নিরুৎসাহিত করা।

ঘ. খাদ্য উৎপাদনে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা: স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ জমি-জলা-প্রাণি-বীজ সম্পদের উপর অধিকার ও স্থায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রান্তিক পর্যায়ের উৎপাদকরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় ও বিতরণের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার বিরাজমান প্রাণসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও সুরক্ষা করতে পারে।

চ. খাদ্য উৎপাদনে স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতায় আস্থা রাখা: খাদ্য উৎপাদনে প্রান্তিক কৃষকের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় জ্ঞানের উপর আস্থা রেখে তার উপর গবেষণা ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই স্থানীয় জ্ঞান সঞ্চারিত করা। পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদনের স্থানিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন প্রযুক্তি বর্জন করা।

ছ. পরিবেশসম্মত উপায়ে খাদ্য উৎপাদন করা: স্থানীয় কৃষিপ্রতিবেশ বিবেচনায় নিয়ে শক্তির অতিরিক্ত অপচয় রোধ, কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহার না করা ও একক ফসল চাষ পরিহার করে পরিবেশ সম্মত উপায়ে বৈচিত্র্যময় খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

খাদ্য সার্বভৌমত্বের এই ধারণা তাই ব্যাপক। এর সাথে জড়িয়ে আছে কৃষকের জীবন, তার সংস্কৃতি, তার বেঁচে থাকা, সর্বোপরি রাজনীতি। রাজনীতি দিয়েই রাজনীতিকে কাউন্টার করতে হয়। এখানে আবেগের চেয়ে কৌশল তাই প্রধান ভূমিকা রাখে। খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণা তাই খাদ্যের উপর আধিপত্যশীল বিদ্যমান কর্পোরেট ট্রেড ও একক মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থা বিলুপ্তির বিকল্প কৌশল। যে কৌশলের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষককে কৃষিজ উৎপাদন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পশুপালন, মৎস্য চাষ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। উৎসাহিত করা হয় স্থানীয় জাতের ফসল উৎপাদন করা, নিজস্ব সংস্কৃতিকে অন্বেষণ করা, নিজেদের পরস্পরের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করা। এসব বিষয়কে অনুপ্রাণিত করা হয় কারণ এর সুস্থায়ীত্ব রয়েছে এবং এটি অর্থনৈতিকভাবে টেকসই একটি প্রক্রিয়। খাদ্য সার্বভৌমত্ব একটি অধিকার যেখানে উৎপাদক ও ভোক্তা সমাজ সমানভাবে উপকৃত হয় ও খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় থাকে। খাদ্য সার্বভৌমত্ব খাদ্য উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত যেসব নিয়ামক আছে যেমন ভূমি, বীজ, পানি, জীব বৈচিত্র্য ও প্রাণি সম্পদ- এসবের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার প্রতিও নজর দেয়। আর এই সঠিক ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে যতরকম বৈষম্য আছে তাকে নিরসনের কথা বলে, যেসব বৈষম্য আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল থেকে শেকড় গেড়ে আছে, যেমন নারী-পুরুষের বৈষম্য, শ্রেণি বৈষম্য, চ্ছ্যুত-অচ্ছ্যুতের বৈষম্য। যে বৈষম্য সামাজিক অসমতা টিকিয়ে রেখে নিপীড়নের, শোষণের সুযোগ তৈরি করে তাকে পেছনে ফেলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে খাদ্য সার্বভৌমত্বের আন্দোলন অভিমূখে এগিয়ে যাওয়া হয়- তা প্রকৃতপক্ষে এক নতুন সামাজিক সম্পর্কের প্রেক্ষিত তৈরি করে। খাদ্য সার্বভৌমত্ব তাই এক সামাজিক আন্দোলনরূপে সামনে চলে আসে।

খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্বের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। খাদ্য নিরাপত্তায় দেখা হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য আছে কিনা, সেই খাদ্য সহজেই কেনা যাচ্ছে কিনা, ক্রয় করার সক্ষমতা মানুষের আছে কিনা। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের নৈতিক দিক অর্থাৎ কে, কোথায়, কী উপায়ে খাদ্য উৎপাদন করছে, কীভাবে তা বিতরণ করা হচ্ছে, সেসব বিবেচনায় রাখে না। কিন্তু খাদ্য সার্বভৌমত্ব খাদ্য উৎপাদনের এইসব নৈতিক দিক আমলে নেয় এবং কাজ করে। যে কারণে খাদ্য উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এসব সুরক্ষাতে কাজ করে থাকে। খাদ্য সার্বভৌমত্বের অধিকার তাই জমি, পানি, বীজ এবং সকল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারকে বোঝায়। আমরা দেখেছি যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়কে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, খাদ্য সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ততটাই অবহেলার। ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষক প্রান্তিক থেকে যায়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটে কৃষি-রাসায়নিকের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে, কিন্তু কৃষি, কৃষক গুরুত্ব পায় না। তাইতো বগুড়ার কৃষক আনসার আলী ঢাকায় সেমিনারে প্রকাশ্যে স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে উচ্চারণ করে- "কৃষকের ঘরে বস্তা ভর্তি ধান, কিন্তু কৃষকের চোখে জল।"



খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় জীববৈচিত্রনির্ভর কৃষি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের গাইডলাইন হিসেবে এফএও খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা নিয়ে আসে। প্রথম দিকে 'খাদ্য নিরাপত্তা' বলতে সাধারণত বোঝানো হত কোন দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতার অবস্থা। পরবর্তিতে এফএও অন্যান্য উপাদান যুক্ত করে, যেমন খাদ্যে সকলের প্রবেশাধিকার, নিরাপদ খাদ্য ও সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, রাষ্ট্রীয় খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা, কৃষকদের খাদ্য ক্রয় বাবদ মূল্য সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তবে এর পাশাপাশি পরিবেশবাদীরা খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য জৈব কৃষি পদ্ধতির পক্ষে প্রচারণা এবং কাজ করতে থাকেন। তাদের মতে জৈব কৃষি কৃষককে শিল্পায়িত কৃষি-রাসায়নিক উপকরণের ও কোম্পানির বীজের উপর নির্ভরতা থেকে মুক্তি দেয় এবং কৃষক পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সবুজ বিপ্লবের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের ফলে অনেক দেশের সরকার জৈব কৃষিতে সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে জার্মানী ও ব্রিটেনে এই জৈব কৃষি আন্দোলনের সূচনা। তবে ১৯৬২ সালে কীটনাশক বিষের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে র‍্যাচেল কারসনের লেখা বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং' প্রকাশের পর উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে এই আন্দোলন বেগবান হয়।[২৩] পরবর্তিতে এটি একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে রাসায়নিক উপকরণ ছাড়া চাষাবাদ, প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি পদ্ধতি এবং জৈব খাদ্যের প্রসারে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছে। তবে ভূমি দখল এবং কৃষি ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোকে ভর্তুকি প্রদান বন্ধ না করা হলে খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে অনেক সময় শুধু জৈব খাদ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদানের ফলে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেশগত জটিলতার গুরুত্বকে অবহেলা করা হয় এবং কৃষকদের জমিতে প্রবেশাধিকারের বিষয়াদি আড়ালে থেকে যায়। কৃষিতে সুস্থায়ীত্ব এবং খাদ্য ন্যায্যতা অর্জনের জন্য, কৃষক যে জমিতে খাদ্য উৎপাদন করবে সেই জমির উপর তার অধিকার, বীজসহ অন্যান্য উপকরণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সার্বভৌমত্ব এবং উৎপাদিত ফসলের উপর কর্তৃত্ব অর্জন জরুরি। এই বিষয়গুলো সর্বপ্রথম উঠে আসে খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিষয়ক হাভানা ঘোষণাতে ২০০১ সালে। এখানে খাদ্যের উপর সকলের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয় এবং কৃষিজীবী, জেলে ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণের এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে সকল জাতি ও পেশার জনগণের খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। অবশেষে ২০০৭ সালে নাইলিনি ডিক্লারেশনে খাদ্য সার্বভৌমত্বে জনগণের অধিকারের বিষয়াবলি শব্দবদ্ধ হয়।

পরবর্তিতে খাদ্য সার্বভৌমত্ব আন্দোলন আরও পরিপক্ক হয় যখন বোঝা যায় যে, বর্তমান খাদ্য সংকটের পেছনে কৃষকদের কোন রকম ব্যর্থতা নেই, বরং এর পেছনে রয়েছে (ক) বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও বিনিয়োগ করা পুঁজি কর্তৃক খাদ্য মজুদকরণ ও ফটকাবাজি, (খ) বৈশ্বিক খাদ্য অবিচার: যেখানে একদিকে কেউ অনেক বেশি খাচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্রের কষাঘাত যেখানে চাষীদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার কেনার মত অর্থ নেই বা প্রয়োজনীয় খাবার উৎপাদন করার মত জমি নেই, (গ) বিভিন্ন পরিবেশ বিধ্বংসী পলিসি, যেমন কৃষি জমিতে মোটরগাড়ি চালানোর জন্য কৃষি-জ্বালানীর চাষের বিস্তার। অর্থাৎ ক্ষুধা মুক্তির জন্য কেবল যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করলেই চলবে না, দেখতে হবে সেই খাদ্য কিভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্পোরেট কৃষি-ব্যবসা নির্ভর বৃহদাকার শিল্পায়িত মনোকালচার চাষ পদ্ধতি ব্যর্থ, যেখানে আমাদের আশা দেখাচ্ছে চাষী নির্ভর সুস্থায়ী কৃষি যার মূল ভিত্তি জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব ধারণাটির পেছনে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে, যেগুলো হয়েছে ভূমি অধিকার, খাদ্য অধিকার, বিকল্প খাদ্য নেটওয়ার্ক, বিশ্বায়ন প্রতিহত করতে অর্থনীতির স্থানীয়করণ ইত্যাদি দাবি আদায়ের জন্য। খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে 'খাদ্য মাইল' কমানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

কিভাবে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি সুস্থায়ীত্ব আনতে পারে (গ্লিসম্যান ফ্রেমওয়ার্ক)[২৪]

ইকোলজি বা প্রতিবেশ বিদ্যা হচ্ছে প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে তা জানা-বোঝার বিজ্ঞান। আর এই বিজ্ঞান ব্যবহার করে সুস্থায়ী ও সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা অর্জনের চর্চা হচ্ছে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি (agroecology)। এটি দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীল ও স্বাস্থ্যকর কৃষি-ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা ও সুরক্ষা করা এবং ন্যায়সঙ্গত জীবনযাত্রার একটি সামগ্রিক কৌশল। কোন স্থানের মাটি, পানি, বাতাস, সেখানকার সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণি ও অনুজীব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাহারকে ইকোসিস্টেম বলে। অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি-ইকোসিস্টেমের জন্য প্রয়োজন ইকোসিস্টেমের সকল প্রবাহ, চক্র এবং ইকোসিস্টেমের উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা। তাই জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির চর্চার মধ্যে রয়েছে: কৃষি ক্ষেতে বা খামারের আকৃতিগত, উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রজাতি ও প্রজাতির জাত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা, রাসায়নিক উপকরণের পরিবর্তে স্থানীয় প্রতিবেশ-সম্মত উপকরণ ও

পদ্ধতি ব্যবহার করা, জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভর শক্তির বদলে খামারের জৈব বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করা, জীববৈচিত্র্য যথাসম্ভব বাড়ানো ও লালন করা, এসকল জীববৈচিত্র্যের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

এখনকার প্রচলিত কৃষি বা খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে সুস্থায়ী ও সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা ও ন্যায়সঙ্গত জীবনযাত্রায় রূপান্তরের জন্য স্টিফেন গ্লিসম্যানের একটি ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে। স্টিফেন গ্লিসম্যান যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার এগ্রোইকোলজি বিষয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। এই ফ্রেমওয়ার্কের পাঁচ পর্যায়ের মধ্যে প্রথম তিনটি পর্যায় কৃষি ক্ষেত বা খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, যা কৃষকরা করতে পারেন। পরবর্তী দুটি পর্যায় কৃষিকে ছাড়িয়ে সামগ্রিক খাদ্য ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। নিচে পর্যায়গুলো দেওয়া হলো:

পর্যায় ১: রাসায়নিক বা কারখানাজাত কৃষি উপকরণের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানো

প্রথম পর্যায়ে রাসায়নিক বা কারখানায় তৈরি করা কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক প্রভৃতি) আরও দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে সেসব উপকরণ যতটা সম্ভব কম প্রয়োগ করতে হয়। এভাবে ব্যয়বহুল ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কৃষি উপকরণের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এসবের নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করা যাবে।

পর্যায় ২: রাসায়নিক বা কারখানাজাত কৃষি উপকরণ ব্যবহার ও চর্চার পরিবর্তে বিকল্প কৃষি উপকরণ ব্যবহার ও চর্চা করা

এই পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ও পদ্ধতির পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করা। যেমন অনেক কৃষক ইউরিয়া বা নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের পরিবর্তে মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে এমন শস্য চাষ করেন (ডাল জাতীয় শস্য, ধইনচা ইত্যাদি), আবার অনেক কৃষক মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করেন। এছাড়া অনেকে রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ না করে প্রাকৃতিকভাবে ফসলের রোগ ও পোকার আক্রমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাথী ফসল চাষ করেন বা শস্য আবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তবে এই পর্যায়ে খামারের ইকোসিস্টেম পূর্বের সরল অবস্থা থেকে খুব বেশি পাল্টায় না। তাই রাসায়নিক নির্ভর কৃষিতে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো এই পর্যায়েও থেকে যায়।

পর্যায় ৩: নতুনভাবে কৃষি-ইকোসিস্টেমকে সাজানো, যাতে এটি প্রতিবেশগত পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে

এই পর্যায়ে খামারের ইকোসিস্টেমের পুরোপুরি বদল করা হয়। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে খামারে বা ক্ষেতে যেসব সমস্যা হতো সেগুলোর পেছনের কারণগুলো দূর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ফসলের সমস্যা হওয়ার পর প্রতিকার না করে, বরং সমস্যা হওয়ার আগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। তাই খামারের ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত শস্য/ অশস্য উদ্ভিদ, প্রাণি ও অনুজীবের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও কার্যকারিতা, পরিবেশের উপাদান এবং এগুলোর নিজেদের মধ্যে সম্পর্কগুলো ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হয় এবং সেই অনুযায়ী খামারের কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এভাবে ইকোসিস্টেমের রূপান্তর নিয়ে কাজ করার

মাধ্যমে, কোন কোন কারণে ফসলের উৎপাদন-ঘাটতি হয়, সেসব বিষয়ে বোঝা-পড়া তৈরি হয়। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী খামারের স্থান ও মৌসুমভেদে ফসল বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা করা হয়, যাতে বাইরের উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন না হয়। পরবর্তিতে খামারের মাটি, পানি ও জলবায়ু উপযোগী নানান ধরনের শস্য, শস্যের নানান ধরনের জাত, বিভিন্ন ধরনের অশস্য উদ্ভিদ ও প্রাণির সমাহার গড়ে তুলে জীববৈচিত্র্য যথাসম্ভব বাড়ানো হয়। এছাড়া মিশ্র চাষ, আবহাওয়া অনুযায়ী শস্য আবর্তন, কৃষি-বনায়ন ইত্যাদি চাষ পদ্ধতি এবং ফসলের সাথে গবাদি পশু-পাখি ও অন্যান্য প্রাণি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিবর্তনের এই পর্যায়ে বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে (ক) বাইরের কৃষি উপকরণের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে স্বাধীন হওয়া যায়, এবং (খ) খামার থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য এবং অন্যান্য বস্তু ও সেবা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায়, যা খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে সহায়ক।

প্রথম দিকে বিজ্ঞান হিসেবে 'জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি'-র ক্রমবিকাশের সময় মূল ফোকাসে এই তিনটি পর্যায় ছিল। কিন্তু ক্রমে বিকল্প বাজার ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব আন্দোলনের বিকাশ এবং জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির সাথে সম্পৃক্ততার ফলে আরও দুটি পর্যায় যুক্ত হয়। কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা শুরু করেন এবং ভোক্তারা খাদ্য উৎপাদকদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি শুরু করেন। অর্থাৎ একটি কৃষি প্রযুক্তি আন্দোলন ক্রমে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

পর্যায় ৪: খাদ্য উৎপাদক কৃষক এবং ভোক্তাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ পুনঃস্থাপন করা

মূলত একটি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে খাদ্য ব্যবস্থার এই পরিবর্তন ঘটে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে ভোক্তাদেরকে অবশ্যই তার এলাকায় উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত ফসল বা খাদ্যের যথাযথ মূল্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া যেসব কৃষক উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ে রয়েছেন তাদেরকে সহায়তা করতে হবে। উৎপাদক ও ভোক্তারা নিজেদের মধ্যে সরাসরি 'খাদ্য নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলে বিশ্বব্যাপী সুস্থায়ী খাদ্য সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নির্মাণ করতে পারেন। কৃষকের বাজার, ভোক্তা সমিতি ইত্যাদি বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য ছোট রাখা যায়। এভাবে কৃষক, ভোক্তা এবং এর মধ্যবর্তী সকলের সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব আসতে পারে।

পর্যায় ৫: নতুন বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার ভিত্তি হবে সমতা, অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র, ন্যায্যতা ও সুস্থায়ীত্ব, যেন পৃথিবীর জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা (life support systems) পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা যায়, যার উপর আমরা সকলে নির্ভরশীল

তৃতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা এবং চতুর্থ পর্যায়ের মাধ্যমে স্থাপিত হওয়া নতুন সম্পর্কের পটভূমিতে, এই পঞ্চম পর্যায় খাদ্য ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সার্বিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। এটা মূলত "আমরা কিভাবে বাঁচবো" বা "সুন্দর জীবন" বলতে আমার কি বুঝি তার উপলব্ধি। তাই এ পর্যায়ে আমরা কিভাবে একে অন্যের সাথে জড়িত এবং যে পৃথিবী আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক, এসব বিষয়ে নতুন ভাবনা ও কার্যক্রম নিতে হবে। তাহলে কৃষক সমাজ কৃষিতে যে পরিবর্তন আনলেন তার প্রেক্ষিতে আমাদের বিশ্বাস, সাহস, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ নতুন রূপ পাবে।

অর্থাৎ কৃষিতে পরিবেশের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার অনুসরণ করা হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশের সাথে ও সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তরের মাধ্যমে সত্যিকারের সুস্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

এই নতুন খাদ্য ব্যবস্থা পরিবেশের দূষণ ও অবক্ষয় হ্রাসের মাধ্যমে বর্তমানের অত্যন্ত জরুরি বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া চাষকৃত ও বন্য জীববৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ হবে। এর পাশাপাশি মাটি, পানি ও বাতাস ব্যবস্থাপনাকে সুস্থ্য রাখবে, যেসব অমূল্য সেবা প্রকৃতি আমাদের দিয়ে থাকে।

উত্তরণের পথ - জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি

নি:সন্দেহে বাংলাদেশ শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছে গেছে এবং এর পেছনে সবুজ বিপ্লবের অবদান আছে। দানা শস্য (ধান ও গম) উৎপাদনে স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালে ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বর্তমানে ৩৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছে গেছে। শস্য নিবিড়করণের হার ১৯১% বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে সবজী, মশলা, ডাল, তেল জাতীয় শস্যের উৎপাদন সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমানে পেঁয়াজ সমস্যা একে তুলে ধরে। হাই ইনপুট সহযোগে উৎপাদনের অন্যান্য সমস্যার কথা আগেই বলেছি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কথা বিশ্বের অন্যান্য দেশ আগেই ভাবতে শুরু করেছে, বাংলাদেশও ভাবছে। সে কারণে সরকার জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, কৃষি নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করেছে।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি এমন কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যা কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে। এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো। এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিস্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে এবং বাইরের উপাদান যেমন ঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়। জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ ভূমি, মাটি রক্ষা করে ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে। যা খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়, বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখে না, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে অবদান রাখে। প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে কৃষি-প্রতিবেশ কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি প্রতিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহকে সংযুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে, একটি সুস্থায়ী কৃষির উদ্দেশ্য হিসেবে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির উদ্দেশ্য টেকনোলজী এবং ইনপুট নির্ভর কৃষির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা নয়, বরং এটি নিরূপন করে যে, কখন, কীভাবে টেকনোলজী প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং মানবিক সম্পদের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যবহৃত হতে পারে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির গ্রহণযোগ্যতা আগে সেভাবে বিবেচ্য ছিল না। কিন্তু এখন আমরা একে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং চর্চা করছি, কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য, কৃষির মূল উপাদান মাটিকে সুরক্ষার জন্য কম ইনপুট ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন করা।



উপসংহার

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তথ্য দেখায় যে, ১৯৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২.৫ বিলিয়ন, ২০০০ সালে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬.১ বিলিয়নে। অনুমিত হয় যে, ২০৫০ সালে তার সংখ্যা হবে ৯.১ বিলিয়ন। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।[২৫] কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাষাবাদকৃত জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

বৈশ্বিক পরিসরে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক চাহিদা গড়ে ২৯০০ কিলোক্যালরী, উন্নত দেশে এর পরিমাণ দৈনিক ৩৫০০ কিলোক্যালরী, উন্নয়নশীল দেশে এর পরিমাণ ২১০০ কিলোক্যালরী, যা পর্যাপ্ত পুষ্টির ঘাটতিস্বরূপ। FAO এর হিসাবমতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৮০০-৮৪০ মিলিয়ন মানুষ ১৯৯৮-২০০০ সালের সময়সীমাতে অপুষ্টিতে ভুগছিল। উন্নত বিশ্বের মানুষ তার দৈনিক চাহিদা পূরণ করে প্রধানতঃ গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগীর মত মাংস জাত খাদ্য থেকে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের দৈনিক কিলোক্যালরীর চাহিদা পূরণ হয় দানাশস্য থেকে। যেখানে দৈহিক চাহিদার অনেক উপকরণ যেমন মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস ও এমিনো এসিডের ঘাটতি থাকে।[২৬] এই ঘাটতি মাংসজাত প্রোটিনের অভাবের কারণে হয়ে থাকে। অন্যদিকে পশুখাদ্যের যোগান দেয় দানাশস্য জাতীয় উৎপাদন। ১৯৬০ সালের পর জনসংখ্যার বৃদ্ধির থেকেও দ্রুতহারে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তা সমভাবে সব দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এশিয়াতে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আফ্রিকাতে সেভাবে নয়। আবার কোন কোন দেশ বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে চাহিদার তুলনায় আরও বেশি। তারপরও এসব উন্নত বিশ্বে অপুষ্টির শিকার জনসংখ্যার অনেকেই। যা FAO খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিসংখ্যানে বেরিয়ে আসে, সংস্থা আরও দেখায় যে, প্রতিবছর ৬ মিলিয়ন শিশু যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে।

বর্তমান সময়ে দৈনিক কিলোক্যালরীর চাহিদা মেটাতে তাই শস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি বড় বড় শহরগুলোতে আছে এটা সত্য তবে শতকরা ৮০% ভাগই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে।[২৭] বলা হয় যে, ক্ষুদ্র পরিসরে এবং টেকসই কৃষির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। এক্ষেত্রে যে উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা হয় তা মূলতঃ হাইব্রীড, উফশী, জিএমও বীজ ভিত্তিক যা কিনা কীটনাশক, সার ও সেচ সংবেদনশীল, অর্থাৎ এসব উপকরণ না দিলে এই পরিমাণ ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। এর ফলে আমরা দেখেছি যে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে– যা উৎসাহব্যাঞ্জক তবে বিতর্কিত।

কৃষির জন্য ভূমি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কৃষি ভূমি ক্রমশঃহ্রাস পাচ্ছে। লবণাক্ততা, খরা ইত্যাদি কারণ। একে পরিপূরণ করা হয়েছে প্রতিবেশ রক্ষা করে এমন সংরক্ষিত এলাকা বিনাশ করে। এছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পানি নষ্ট করা হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রকৃতিকে যেমন অস্থিতিশীল করেছে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হয়েছে। অন্যদিকে চাষাবাদে রাসায়নিক দ্রব্যের (সার এবং কীটনাশক) নিবিড় ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক হারে, বিশেষ করে সবুজ বিপ্লবের কারণে। এতে ধান, গম, ভূট্টার উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা নিয়ে আসে বিশ্বব্যাপী।[২৮]

এসব রাসায়নিক সার যেমন নাইট্রেট, ফসফেট এবং সুপার ফসফেট সার বিশেষ করে ভারী ধাতু যেমন ক্যাডমিয়াম ও আর্সেনিকের সাথে মিলে পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে কীটনাশকের ব্যবহার ফসলের কীটের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পোকা-মাকড়কেও যেগুলো টার্গেট নয় তাদেরও বিনাশ করে। সেই সাথে এসব কীটনাশক মাটি এবং পানিতে মিশে যায় এবং মানব দেহে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। কিন্তু আমরা দেখছি যে, বালাইনাশক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগতই বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক উৎপাদন করে যাচ্ছে। গবেষণা দেখায় যে, বিশ্বে ৮০০ ধরনের কেমিক্যাল রেজিস্ট্রিকৃত বালাইনাশক হিসেবে। এসব কেমিক্যালের পরিবেশের উপর আচরণ কেমন তার সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি।

এসব রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বে শ্রম মজুরী অনেক বেশি বলে সেখানে নিড়ানীর বদলে আগাছানাশক বেশি ব্যবহৃত হয়। যদিও এখন উন্নয়নশীল বিশ্বেও এর প্রয়োগ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ বর্তমানে এসব দেশেও কৃষি মজুরের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বিভিন্ন কারণে।[২৯] তুলনামূলকভাবে আমাদের মত দেশগুলোতো বালাইনাশক ব্যবহার করা হয় বিপুলভাবে এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। এর ফলস্বরূপ কৃষক সরাসরি এসব বিষাক্ত ওষুধের সম্পর্কে চলে আসে অসাবধানতা এবং অজ্ঞানতার কারণে। যার প্রভাব পড়ে তাদের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমে। ফলে অপরিণত সন্তান জন্মের হার বেড়ে যেতে পারে এর কারণে।[৩০]

উন্নত বিশ্ব বর্তমানে কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে থাকে। এটা করে নতুন নতুন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে। যে কারণে এসব দেশের উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যে রাসায়নিকের উপস্থিতির হার প্রতিবেশ এবং মানবদেহ সহিষ্ণু কিনা তা রীতিমত পরীক্ষার মাধ্যমে, প্রত্যয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। সেক্ষেত্রে তারা খাদ্যদ্রব্যে কতটুকু হারে এসব রাসায়নিক গ্রহণযোগ্য তার পরিমাপ নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব সুযোগ এবং ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান ঝোঁক থাকে শুধুমাত্র উৎপাদনের উপর, আর কোন কিছু নয়। সেক্ষেত্রে কেমিক্যাল ব্যবহারে যেসব দ্রব্য সস্তা তার প্রতি আগ্রহ থাকে, যা কিনা বেশি ক্ষতিকর। একারণেই একসময় আমাদের মত দেশে DDT, HCH, BCH এর মত ওষুধ প্রয়োগ হতো যথেচ্ছভাবে। পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে এসব সস্তা বালাইনাশক তৈরি হতো এবং বাংলাদেশ, ফিলিপাইন এবং ল্যাটিন আমেরিকার মত দেশ এসব দ্রব্যের বিক্রির ক্ষেত্র ছিল। বর্তমানে এসব রাসায়নিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু এতদিন যা ব্যবহার করা হয়েছে প্রকৃতিতে তার প্রভাব থেকে যাবে আরও বহু বছর।

বর্তমানে বায়োটেকনোলজী এবং জেনেটিক্যালী মডিফায়েড অর্গানিজম সংক্ষেপে জিএমও শস্যের বিকাশে কাজ করছে AVENTIS, MONSANTO, NOVERTIS, ZENECA-এর মত বহুজাতিক কর্পোরেট গোষ্ঠী। GMO নিয়ে বিতর্ক আছে। সর্বোপরি GMO শস্য ক্রমবৃদ্ধিমান জনসংখ্যাকে খাওয়াতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে এমনটি প্রমাণিত নয়। এর পাশাপাশি অর্গানিক কৃষিরও প্রসার ঘটছে। অর্গানিক কৃষি প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায়, মানবস্বাস্থ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু খাদ্য চাহিদা মিটাতে জৈবকৃষি কতটা সক্ষম হবে এই প্রশ্নের এখনও উত্তর মেলেনি।

শিল্পনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তকরা একটা বিষয়ে সবসময় ফোকাস করে থাকেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সঙ্গতি রেখে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না করলে খাদ্যের অভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের কারণ খাদ্য উৎপাদন হ্রাস নয়, বরং বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি এবং রাজনৈতিক নীতির অদূরদর্শিতার কারণেই তা ঘটেছে। এই বিষয়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।[৩১] তাঁর মতে উপরোক্ত কারণেই এই উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষের মত বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছিল। বাজারে পর্যাপ্ত খাবার ছিল কিন্তু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ছিল না এবং বন্টনে অব্যবস্থাপনা ছিল। বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয় তাতে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার সবাই পর্যাপ্ত খাবার পেতে পারে, কিন্তু এখনও এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে ক্ষুধা ও অপুষ্টির অভাবের কারণে প্রচুর মানুষ মারা যায়। এসব দিকগুলো আমাদের আরও বেশি করে অনুধাবন করতে হবে।

অমর্ত্য সেন বাংলাদেশ, ভারত ও সাব-সাহারা আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে Poverty & Famine বইতে দেখান যে, খাদ্য ঘাটতিই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ এটা সত্য নয়। দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশেও খাদ্য উদ্বৃত্ত দেখা গেছে। তিনি বলেন 'একদিকে খাবার উদ্বৃত্ত থাকতে পারে, অন্যদিকে অর্থ-সামাজিক অধিকার না থাকার কারণে মানুষ অনাহারে মরতে পারে। বাজার এক্ষেত্রে মানুষ বাঁচাতে এগিয়ে আসেনা। উল্টো দাম বাড়ানোর প্রবণতাকে

আরও উসকে দিতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই ভূমিকা নিতে হয় মানুষের হাতে আয় বাড়ানোর জন্যে। রাষ্ট্র সাধারণত এগিয়ে আসতে চায় না। শক্তিশালী বিরোধী দল, স্বাধীন গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্রই পারে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করতে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সক্ষমতা। মানুষের সক্ষমতা না বাড়লে, খাদ্যমজুত থাকা সত্ত্বেও একটি দেশে অভাব অনটন বা দুর্ভিক্ষের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।[৩২]

অমর্ত্য সেন একজন উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ। তিনি চলমান উন্নয়ন ভাবনার মূলস্রোতকে অস্বীকার না করেও বঞ্চিত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কী করে নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা যায় তার প্রচেষ্টাই করেছেন। তাঁর মতে 'রাষ্ট্র ও বাজার মিলেই জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী হলে তা সম্ভব নয়। এজন্যে Soft State হতে হবে যা মূলত: জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। অমর্ত্য সেন আরও বলেন দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে যায় কিন্তু অভাব অনটনে মানুষ আধমরা হয়ে বেঁচে থাকে। '৭৪ সালে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সাময়িকভাবে কিন্তু অনটন এখনও আমাদের নিত্যসঙ্গী। তিনি শ্রীলংকা ও চীনের মত দেশের উদাহরণে দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত চীন বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। পরবর্তীতে চীন বাজারকে কাজ করতে দিয়েছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছে। এভাবে বাজার ও রাষ্ট্র সমন্বিত ভূমিকা পালন করে মানুষের বঞ্চনা কমিয়েছে। তবে কেমন বাজার, কেমন সরকার সেসব বিষয়ের উপর নজর দেওয়া দরকার।

তাঁর মতে মানুষের হাতে আয় কমে গেলে খাদ্যের উপর স্বত্বাধিকারও কমে যায়, যা দুর্ভিক্ষের কারণ। তাই খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি মানুষের হাতে আরও আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা হওয়ার প্রধান কারণ ছিল এক ফসল মৌসুমে মানুষের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে তাই নানাভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। আর এজন্যে প্রয়োজন সমন্বিত জন উদ্যোগ, প্রয়োজন গণতন্ত্রের, স্বাধীন গণমাধ্যমের। প্রয়োজন প্রবল জনসচেতনতা। কারণ জনগণের সক্রিয়তাই যে কোন দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।[৩৩]

অমর্ত্য সেন সমন্বয়ের কথা বলেছেন। ম্যাক্রো স্থিতিশীলতা ও খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষমতায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় ধরণ, গণতন্ত্র ও খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক, যুদ্ধ ও খাদ্য নিরাপত্তার মত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের (Neo-classical economist) একাংশ অর্থনীতি বিষয়টিকে নৈতিকতা বিবর্জিত একটি ক্লিনিক্যাল বিজ্ঞানে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। বিদ্যমান এই মডেল সরকারের ক্ষমতা হরণ করেই বাজারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করছে। কিন্তু শুধু বাজার বা শুধু সরকারের ওপর জোর দিয়ে অনুন্নয়নের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। দুয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। কেননা বাজার এবং সরকার একে অপরের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। দেশে আইন কাঠামো শক্তিশালী না থাকলে, আইন শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে বাজার ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। সোমালিয়াতে যে কারণে বাজার কাজ করতে পারছে না।

বাংলাদেশে বিদেশী দাতাদের খবরদারিত্বে রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব হয়ে এমন এক বাজার ব্যবস্থা চালু হয়েছে যেখানে কোম্পানী কৌশলে তার স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কৃষিতে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি। এখানে অমর্ত্য সেন এর ভাবনার প্রতিফলন হচ্ছে না।

তবে অধ্যাপক আনিসুর রহমান অমর্ত্য সেন এর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ক্ষমতার উপর বেশি নির্ভর না করে স্থানীয় সমাজ বা গ্রুপগুলোর সৃজনশীলতাকে আলোকপাত করেন। আনিসুর রহমানের এই ভাবনার যথার্থতা আছে এজন্যে যে, স্থানীয় সমাজ ও গ্রুপগুলো তাদের নিজস্ব সৃজনীশক্তি দ্বারা রাষ্ট্রীয় নীতি, বাজার ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্প একটি ধারা তৈরি করতে পারে। যেখানে তারা তাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খাদ্য সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে যা কাজ করে। কৃষক স্থানীয় বীজের দ্বারা ধান উৎপাদন করে নিজের খোরাকী সম্পন্ন করতে পারে। বাজার কিংবা রাষ্ট্র নির্ধারিত ধান উৎপাদন করে মূল্য না পাওয়ার হতাশায় আচ্ছন্ন হতে হবে না। কিংবা ভারতে কৃষক যে আত্মহত্যা করছে সে ধরনের পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হবে না। গণগবেষণা তত্ত্বের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ সম্ভব। ভারতে বন্দনা শিবা[৩৪] কিংবা লা ভিয়া ক্যাম্পাসিনার মত উদ্যোগ সে বিষয়টাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

বলা হয়ে থাকে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি না করলে খাদ্য ঘাটতি তৈরি হবে। কিন্তু আমরা এখন জানি যে খাদ্য ঘাটতি তৈরি হবার পেছনে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার একমাত্র কারণ নয়। খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য বন্টনে অসমতা ও এর একটি কারণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেখলে দেখা যায় যে, কোন কোন দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও সে দেশের জনগোষ্ঠীর একাংশ না খেয়ে থাকে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। যেখানে প্রচুর খাদ্য থাকা সত্ত্বেও ২৬ মিলিয়ন মানুষ খাবার পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় ভুগে থাকে।[৩৫]

খাদ্য নিরাপত্তা সহজ কোন বিষয় নয় এবং ব্যক্তিকভাবেও তা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় নীতি। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনভাবে নীতি প্রয়োগের ক্ষমতা খুবই সীমিত। বিভিন্ন হিসাব নিকাশে তারা বৈশ্বিক রাজনীতির মধ্যে অন্তরীণ। তবে এর মধ্যেও যদি নীতি নির্ধারকদের সদিচ্ছা থাকে তাহলে খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণায় আস্থা রাখতে হবে। সেই সাথে এই আঙ্গিকে, এই বিষয়ে আরও গবেষণা করতে হবে, কাজ করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। জানতে হবে দেশের খাদ্য চাহিদা কতটুকু এবং এর সঙ্গে পুষ্টিগুণ, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা, খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং পরিসংখ্যানের শুদ্ধতা। কেননা আমরা দেখেছি পরিসংখ্যানের ক্রশচেক করতে গেলেই সেখানে তথ্যগত ভ্রান্তি চলে আসে। যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে খাদ্য সার্বভৌমত্বকে প্রণিধান করতে হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্থ খাদ্য নিরাপত্তা নয়। বলা হয় যে, খাদ্য সার্বভৌমত্ব বজায়ে দেশীয় বীজ, দেশীয় ফসল উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে বলা হয় এসব বীজ এবং ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা কম। আর উৎপাদন কম হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু এই ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। এসব ধারণা প্রচারিত হয়েছে সেই সময়ে, যখন 'সবুজ

বিপ্লব'কে এদেশে প্রসারিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞান এগিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে জ্ঞানের প্রসারণ ঘটেছে। দেশ বিদেশের জ্ঞানের সাথে পরিচিতি ঘটেছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেখা গেছে যে, দেশীয় বীজ বা স্থানীয় বীজ মানেই উৎপাদন কম - এই ধারণা ভ্রান্ত। বেশি ফলন হয় এমন ধানের বীজও আছে। ড. রিচারিয়া দেখিয়েছিলেন যে, লালস্বর্না বিঘাতে ২২ মন পর্যন্ত ফলন দেয়। কেরালাসুন্দরী ধানের ফলনও উল্লেখ করার মত।[৩৬] এখানে এ বিষয়টা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র ফলন দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা মাপা যায় না। সেখানে গুণ বিচারটাও গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুণ বিচারে দেশজ ধানের যে বৈভব আমরা দেখতে পাই, তুলনায় রাসায়নিক ধান গৌণ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ধান বিজ্ঞানী ড. দেবল দেব তার লেখায় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন।[৩৭] আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত ছিল না বলে এসব জ্ঞান বা তথ্য সকলের কাছে সুলভ ছিল না। নতুবা এসব স্থানীয় বীজ আগেও ছিল, ঐতিহ্যগতভাবে এখনও কিছু পরিমাণে আছে। যোগাযোগের সুলভতার জন্যে কৃষকের কাছে এখন যা প্রবেশযোগ্য। কৃষক এখন জানে এসব বীজের কথা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে জৈব সার তৈরির জ্ঞানও তার জানা আছে, যা কিনা মাটির স্বাস্থ্য ভাল রেখে ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ মাত্রই অধিক উৎপাদন এই মিথও সবক্ষেত্রে এবং সবসময় সঠিক এই ধারণারও পরিবর্তন হচ্ছে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাটি যদি জৈবসমৃদ্ধ না হয়, তাহলে উৎপাদনও ক্রমশঃ কমতে থাকে। এক্ষেত্রে জৈব সম্পদ সংরক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। সেই সাথে গ্রামীণ কুটির শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভূমিক্ষয় রোধ, ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে হবে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি গ্রহণ করতে হবে। কেননা বর্তমানে কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে, বিশেষ করে জৈব কৃষি নিয়ে। যেখানে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জৈব কৃষির স্থায়িত্ব বেশি, এর খরচ কম এবং কৃষকের জন্যে তা লাভজনক। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর পরিমাণ হতাশাজনক নয়। ভারতের বন্দনা শিবা এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তার Principals of Organic Farming' বইতে।

অন্যপক্ষে ছোট ছোট কৃষি খামারগুলোর দিকে নজর দিতে হবে যারা অর্গানিক কৃষির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য তৈরি করতে পারে। তাদের নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে যাতে শারীরিক পুষ্টি লাভ সম্ভব। বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করে অপুষ্টির হার যেখানে বেশি সেসব দেশে সূচিন্তিত এবং সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে অপুষ্টি রোধ করে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে সামগ্রিক সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে নয় প্রযুক্তির সহায়তায়ই বৈশ্বিক খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে প্রকৃতি পরিবেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখা সম্ভব। এর জন্য দরকার যথাযথ পরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিহার, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং দেশজ জনগোষ্ঠীর সচেতনতা। তাহলেই খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীববৈচিত্র্য সমভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ১০

২. Food and Agriculture Organization (FAO)

৩. FAO : Roles of Agriculture Project (ROA), Deutsche Bank Research : Agri-business and Hunger, February 12, 2010

৪. World Development Report-2005

৫. সুরাইয়া বেগম, কৃষি প্রতিবেশ : ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, ২০১৮

৬. Bangladesh Economic Review 2019, Finance Division, Ministry of Finance, June 2019, Pp.94 -104

৭. ফরিদা আখতার, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন যথেষ্ট নয়, খাদ্য নিরাপদ করতে হবে। See : http://ubinig.org/index:php/network details/show article/10/109/bangla

৮. http://fpmu.gov.bd/agridrupal/content/screening-nutritionally-rich-and-low-glycemic-index-bangladeshi-rice-varieties

৯. https://www.health.harverd.edu/diseases-and-conditions/glyremic-index-and-glycemic-load-for-100-foods

১০. বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ, ২০১৯, পৃ: ৯৭

১১. অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, খাদ্য অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৭ নভেম্বর ২০১৯

১২. নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও গুরুত্ব, ইউনিট ৫, পৃ: ১৫৫

১৩. 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪. Bangladesh Economic Review, 2019. P. XXX111

১৫. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে পারিবারিক খামার, মোঃ ফরহাদ হোসেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬. নগরীতে নিরাপদ সবজীর হাট ০৮-১২-২০১৯, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত

১৭. Preliminary Report on Agricuture Census 2019, BBS, Ministry of Planning

১৮. যোবায়ের আল মাহমুদ, বায়োকলোনিয়ালিজম ও বাংলাদেশের খাদ্য রাজনীতি, যোবান, ২০১৮

১৯. William D Schanbacher, The Politics of Food, The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignty, Praeger, 2010, pp. 35-38

২০. McMichael, P. (1995): The New Colonialism, global regulation and the restructuring of the inter-state system" in D. Smith and J. Böröcz (Eds.) "A new world order?: global transformations in the late twentieth century" pp 37-56, Westport, Greenwood press

২১. যোবায়ের আল মাহমুদ, বায়োকলোনিয়ালিজম ও বাংলাদেশের খাদ্য রাজনীতি, যোবান, ২০১৮

২২. এবিএম তৌহিদুল আলম , খাদ্য সার্বভৌমত্ব, Barciknews, ২৫ এপ্রিল ২০১৭,

২৩. Deb, Debal, "Food Sovereignty, Opposing the Enclosure of Lord, Seeds and Knowledge Commons" in Stefan Mentsehel edited *Can Hunger be Defeated? Advancing Food Securities in South Asia*, RLS, Delhi, 2019

২৪. Gliessman, S. Friedmann, H. Howard, P.H. (2019) Agroecology and Food Sovereignty in the IDS Bulletin Vol. 50 No. 2 (https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/3038/3002)

২৫. Farnado P. Carvalho, Agriculture, Pesticides, Food Security and Food Safety, Journal of Environmental Science & Policy, No. 9, 2006, PP. 685-692) (FAO 2002)

২৬. FAO, The state of food insecurity in the world 2002. Economic and Social Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2002

২৭. FAO, The state of food Insecurity in the world 2005, Economic & Social Deplt, FAO, Rome, 2005) । এর প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে (World Food Summit)

২৮. Borlaugh N., Dowswell C.R., Fertilizer : To nourish infertile soil that feeds a Fertile population that crowds a fragile world in proceeding of the 61st International Fertilizer Association Annual Conference, 1993

২৯. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুবাইয়া বেগম, বাংলাদেশের নারী কৃষক ঃ অবমূল্যায়ন ও অস্বীকৃতির আধার, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, ২০১৮

৩০. Bretveld R.W., Thomas C.M.G., Scheepers P.T.J., Zielhuis, G.A, Roeleveld N. Pesticide exposure : The hormonal function of the female reproductive system disrupted? Reprod. Biol, Indocrinol 2006, P.4, 30

৩১. অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি কলকাতা, ১৪০১ বাং (২০০৫ ইং)

৩২. আতিউর রহমান, রবীন্দ্র অমর্ত্য ভাবনা : মানুষের জন্য উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০, পৃ . ১১৪

৩৩. অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, কলকাতা, ১৪০১ বাং (২০০৫ ইং) পৃ. ১২১-১২২

৩৪. Vandana Shiva, P Pandey and J. Singh, “Principles of Organic Farming, New Delhi, 2004

৩৫. Debal Beb, Beyond Developmentality : Constructing Inclusive freedom and Sustainability, Earthsean Publication, London, 2009

৩৬. অনুপম পাল, বাংলার কৃষি ও কৃষক, নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০১৫

৩৭. Dr. Debal Deb, Valuing Folk Crop Varieties for Agroecology and Food security, 26 October 2009, http://www.bioscienceresource.org



RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in